নবযুগের মহাদানব

হেমেন্দ্রকুমার রায়

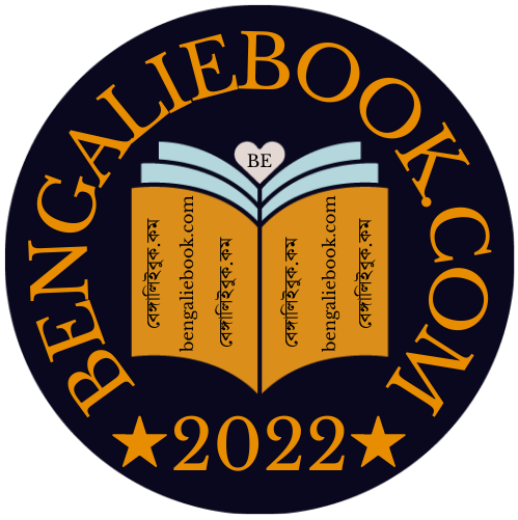

নবযুগের মহাদানব

প্রথম পরিচ্ছেদ । অলৌকিক দস্যু

কলকাতার মায়ারজ্জু ছেদন করেছিল জয়ন্ত ও মানিক।

বাসা বেঁধেছিল তারা পুরীর সমুদ্রতটে, একেবারে এক দিকের শেষ বাড়িতে। সেখানে মানুষের আনাগোনা খুব কম, চোখ খুললেই দেখা যায় কেবল নীল সাগরের তরঙ্গের পর তরঙ্গ সাদা ফেনার মালা পরে সুদীর্ঘ সৈকতের উপরে ভেঙে পড়ছে আর পড়ছে আর পড়ছে– ভেঙে পড়ছে অহরহ, কিবা রাত কিবা দিন! সূর্য এসে চন্দ্র এসে সেই সদাচঞ্চল চলচ্চিত্রের উপরে মাখিয়ে দিয়ে যায় সোনালি-রূপোলি আলোর পালিশ। আরও দূরে নজর চালিয়ে যাও, পাবে কেবল নিস্তরঙ্গ, নিশ্চেষ্ট নীলিমার অসীমতা এবং সর্বক্ষণই মুগ্ধ চোখে ওই দেখতে দেখতে তৃপ্ত শ্রবণে শুনতে পাবে তুমি সেই রোমাঞ্চকর, সুগম্ভীর মহাসঙ্গীত, পৃথিবীতে মনুষ্য সৃষ্টিরও লক্ষ লক্ষ বৎসর আগে থেকে মহাসাগর প্রত্যহই যা গেয়ে আসছে বিপুলোৎসাহে।

নিশ্চিন্ত আলস্যের ভিতর দিয়ে শুয়ে, গড়িয়ে স্বপন দেখে পরম সুখে বেশ কেটে যাচ্ছিল দিনের পর দিন। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাসা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে সাগর-সৈকতে পদচারণ, বালুকাশয্যা থেকে সাগরতরঙ্গের দেওয়া বিচিত্র উপহার সংগ্রহ, দুপুরে সমুদ্রের নীল জলে ডুবে এবং ভেসে এবং সাঁতার কেটে অবগাহন, বৈকালে নুলিয়াদের ডিঙায় চেপে সাগর ভ্রমণ এবং রাত্রে সমুদ্রের নৃত্যশীল বীচিমালার উপরে হিরার গুঁড়ো ছড়িয়ে জ্যোৎসার লীলা দর্শন। কলকাতার কথা তাদের মনেও পড়ত না। কিন্তু আচম্বিতে কলকাতা একদিন জানিয়ে দিলে নিজের অস্তিত্ব। নগর ত্যাগ করে জনতার নাগালের বাইরে পলায়ন করলেও নাগরিকদের মুক্তি দেয় না নগরের নাগপাশ।

এল একখানা টেলিগ্রাম, বহন করে এই সমাচার

জয়ন্ত, অবিলম্বে কলকাতায় চলে এসো–ভয়াবহ মামলা–কোনও গতিকে বেঁচে গিয়েছি–ঘটনার পর ঘটনা–তোমরা নেই বলে অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় পড়ে আছি– সুন্দর।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জয়ন্ত কেবল বললে, হুঁ।

মানিক বললে, আমরা ছাড়তে চাইলেও কমলি আমাদের ছাড়বে না।

নিশ্চয়ই খুব জটিল, রহস্যময় মামলা।

বলা বাহুল্য। কিন্তু আমাদের পক্ষে এখন কিংকর্তব্য?

বাঁধো তল্পিতল্পা, কেনো কলকাতার টিকিট।

.

পুরী থেকেই জয়ন্ত টেলিগ্রামে সুন্দরবাবুকে জানিয়ে দিয়েছিল কবে, কখন তারা কলকাতায় এসে পৌঁছোবে।

কাপড়চোপড় বদলে, হাত-মুখ ধুয়ে তারা সবে চা পান করতে বসেছে, এমন সময়ে সুন্দরবাবুর আবির্ভাব। রীতিমতো হন্তদন্ত মূর্তি।

জয়ন্ত বললে, আসতে আজ্ঞা হোক। চা-টা আনতে বলি?

আরে, থ্রো করো তোমার চা-টায়ের কথা। আগে মামলাটার কথা শোনো।

বসুন।

মানিক বুঝলে, সুন্দরবাবু যখন চায়ের সঙ্গে টাএর লোভ সংবরণ করলেন, ব্যাপার তখন নিশ্চয়ই গুরুতর।

সুন্দরবাবু, উপবেশন করে খবরের কাগজ থেকে কেটে নেওয়া একটা অংশ জয়ন্তের হাতে দিয়ে বললেন, প্রথমে এইটে পড়ে দেখো। ঘটনাটা ঘটেছে তেসরা মে তারিখে।

জয়ন্ত পাঠ করলেঃ

কলকাতায় অলৌকিক অতিকায় দস্যু

গতকল্য রাত্রি সাড়ে দশটার সময়ে চিনুভাই চুনিলাল ও হীরালাল গোবিন্দলাল নামে দুইজন রত্নব্যবসায়ী নিজেদের দোকান বন্ধ করিয়া বাসার দিকে ফিরিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে ছিল বহুমূল্য রত্নে পরিপূর্ণ দুইটি ছোট ব্যাগ। বড়বাজারে বাসার সামনে আসিয়া তাহারা যখন রিকশা হইতে নামিবার উপক্রম করিতেছেন, তখন পিছন হইতে হঠাৎ একখানা কালো রঙের প্রাইভেট মোটরগাড়ি আসিয়া রিকশার উপর ধাক্কা মারে, রিকশাখানি তৎক্ষণাৎ উলটাইয়া যায় এবং আরোহী দুই জনও পথের উপরে পড়িয়া গিয়া আহত হন।

ঠিক সেই সময়ে মোটরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায় অদ্ভুত এক মূর্তি। তাহার সঠিক বর্ণনা কেহই দিতে পারিতেছে না বটে, কিন্তু মোটামুটি এইটুকু জানা গিয়াছে যে, মূর্তিটার মাথার উচ্চতা অন্তত সাত ফুটের কম হইবে না। তাহার মুখ মানুষের মতো, কিন্তু তাহার চক্ষু দিয়া নির্গত হইতেছিল বিদ্যুতের মতো তীব্র এমন দুইটি অগ্নিশিখা, যা পথের অন্ধকারকে আলোকিত করিয়া তুলিয়াছিল মোটরের হেডলাইটের মতো। তাহার দেহও মানুষের মত, কিন্তু সেই দেহের উপরে ছিল লোহার বর্ম বা ওইরকম কঠিন কোনও কিছু।

চোখের পলক ফেলিতে না ফেলিতে সেই বীভৎস মূর্তিটা রত্ন-ব্যবসায়ীদের উপরে ঝাপাইয়া পড়িয়া মূল্যবান ব্যাগ দুইটি ছিনাইয়া লয়, –চিনুভাই বাধা দিবার চেষ্টা করিতেই সে তাহাকে এমন সজোরে ঘুসি মারে যে, চোয়ালের হাড় ভাঙিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ অচেতন হইয়া পড়েন। পরমুহূর্তে মূর্তিটা আবার মোটরে গিয়া ওঠে এবং ড্রাইভারও তিরবেগে গাড়ি চালাইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়।

এমন অমানুষিক দস্যু কেহ কখনও দেখে নাই এবং এমন অসম-সাহসিক রাহাজানির কথাও কেহ কখনও শ্রবণ করে নাই। বড়বাজারে ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে। অনেকেই ব্যাপারটাকে অলৌকিক ঘটনা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যে লৌকিক রহস্য হইতেছে যে, হতভাগ্য রত্ন বণিকদের প্রায় লক্ষাধিক টাকার জিনিস খোয়া গিয়াছে। পুলিশ জোর তদন্তে নিযুক্ত হইয়াছে। খোঁজখবর লইয়া আমরা পরে এ সম্বন্ধে আমাদের মতামত প্রকাশ করিব।

জয়ন্তের পাঠ শেষ হলে পর সুন্দরবাবু আর এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিয়ে বললেন, ওই কাগজেই দ্বিতীয় একটি ঘটনার বিবরণ বেরিয়েছে। এগারোই মে তারিখের ঘটনা।

জয়ন্ত আবার পড়লেঃ

আবার সেই অমানুষিক দস্যু

অতিকায় অমানুষিক দস্যু দ্বিতীয়বার দেখা দিয়াছে।

গুলজারিমল আগরওয়ালা একজন বিখ্যাত মারোয়াড়ি ব্যবসায়ী। গতকল্য সন্ধ্যার পর তিনি নিজের মোটরে মফস্সল হইতে কলিকাতায় ফিরিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিল মোট পনেরো হাজার টাকা মূল্যের কয়েকটি সোনার বার বা তাল। সেগুলো একটা কাঠের বাক্সের ভিতরে বন্ধ ছিল। গাড়ির মধ্যে ছিল আরও তিনজন লোক–চালক ও দুইজন দ্বারবান, তাদের মধ্যে একজন বন্দুকধারী।

গাড়ি যখন দমদম ছাড়াইয়া আসিয়াছে, তখন বিপরীত দিক হইতে হঠাৎ একখানা কালো রঙের প্রাইভেট মোটর ছুটিয়া আসিয়া পথ জুড়িয়া দাঁড়াইয়া পড়ে। গুলজারিমলের ড্রাইভারও তার গাড়ি থামাইতে বাধ্য হয়।

আচম্বিতে কালো রঙের গাড়ির ভিতর হইতে একটা ভয়াবহ মূর্তি পথের উপরে লাফাইয়া পড়ে! মাথায় সে প্রায় সাত ফুট লম্বা এবং তার দুই চক্ষে জুলজুলে প্রচণ্ড অগ্নিশিখা! তার

সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখিয়া গাড়ির আরোহীদের দেহ-মন-চক্ষু দারুণ আতঙ্কে আচ্ছন্ন হইয়া যায় এবং তাদের সেই আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিতে না কাটিতেই মূর্তিটা গাড়ির ভিতরে লাফাইয়া পড়ে। তারপর প্রত্যেক আরোহীকেই এমন বিদ্যুৎবেগে শিশুর মতো শুন্যে তুলিয়া পথের উপরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয় যে, কেউ একখানা হাত পর্যন্ত নাড়িবারও অবসর পায় না।

পথের ওপরে গিয়া পড়িয়া কেউ অর্ধচেতন ও কেউ-বা একেবারেই অচেতন হইয়া যায়। তারপর ভালো করিয়া জ্ঞান ফিরাইয়া পাইবার পর তারা দেখে, গুঞ্জারিমলের গাড়ির ভিতর হইতে সোনার তালের বাক্সটা অদৃশ্য এবং সেই কালো গাড়িখানারও আর কোনও পাত্তা নাই।

বেশ বুঝা যাইতেছে, এই আশ্চর্য ও ভয়াল মুর্তিটাই গত তেসরা তারিখের রাত্রে বড়বাজারে গিয়া রাহাজানি করিয়াছিল। এমন রহস্যময় ঘটনা কলিকাতায় আর কখনও ঘটিয়াছে। বলিয়া শুনি নাই। পুলিশ যদি অবিলম্বে এই রহস্যের কিনারা করিতে না পারে, তাহা হইলে কলিকাতায় কোনও ধনীই আর নিজের ধনপ্রাণ নিরাপদ বলিয়া মনে করিতে পারিবেন না।

পড়া শেষ করে জয়ন্ত বললে, এর পরেও আর কোনও ঘটনা ঘটেনি তো?

সুন্দরবাবু বললেন, ঘটেছে বই কী! কিন্তু এবারে ঘটনাস্থলে প্রবেশ করবেন সুন্দরবাবু স্বয়ং।

বলেন কি।

এইবার তোমরা আমার মুখেই শুনতে পাবে প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা।

তাহলে সেই অমানুষিক মূর্তির সঙ্গে আপনারও চাক্ষুষ পরিচয় হয়েছে?

হ্যাঁ, শোনো!

.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । অগ্নিচক্ষুর কাণ্ড

সুন্দরবাবু বললেন, সতেরোই মে তারিখের রাত্রি। কলকাতার পথে-পথে আজকাল গুন্ডার অত্যাচার বড়ই বেড়ে উঠেছে। রোজই থানায় থানায় নালিশের পর নালিশ হয়। তাই সেদিন রাত বারোটার পর জনকয় লোক নিয়ে রোদে বেরিয়েছিলুম, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘটনাগুলো ঘটে রাত্রিবেলাতেই।

হঠাৎ কানহাইয়ালাল হরগোবিন্দের গদির সামনে গিয়ে দেখি হুলুস্থুল কাণ্ড! লোকজনের ছুটোছুটি, হুটোপুটি, চিৎকার, আর্তনাদ-সে কী হল্লা! তাড়াতাড়ি দলবল নিয়ে সেইদিকে দৌড়ে গেলুম। গদির ভিতর থেকে একজন লোক বাইরে বেরিয়ে ছুটে পালিয়ে আসছিল, তার একখানা হাত চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করলুম, ব্যাপার কী? সে সভয়ে পিছনপানে একবার তাকিয়েই কাঁদো কাঁদো গলায় বলে উঠল, ভূত! দৈত্য! রাক্ষস! তার পরই প্রাণপণ শক্তিতে এক টান মেরে আমার হাত ছাড়িয়ে চটপট পা চালিয়ে পালিয়ে গেল!

ভূত? দৈত্য? রাক্ষস? তোমরা বুঝতেই পারছ তো, তার আগেই কলকাতার ওই দুটো আশ্চর্য ঘটনার কথা আমার কর্ণগোচর হয়েছে। আমারও মনটা তৎক্ষণাৎ চাঙ্গা হয়ে উঠল। হুম, পুলিশের কাছে ভূত-দৈত্য-রাক্ষস বলে কিছুই নেই-ডিউটি ইজ ডিউটি! সাক্ষাৎ শমনের নামেও ওয়ারেন্ট বেরুলে আমরা তাকে গ্রেপ্তার করবার চেষ্টা করব। ভগবানের হুকুমের উপরেও থাকে আমাদের ওপরওয়ালার হুকুম। সুতরাং সেই ভূত কিংবা রাক্ষসের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে পাহারাওয়ালাদের ডেকে নিয়ে গদির ভিতরে ঢুকব ঢুকব করছি, এমন সময়ে শুনতে পেলুম, বাড়ির ভিতর থেকে বাইরের দিকে এগিয়ে আসছে কেমন একটা ধাতব শব্দ-ঘটাং, ঘটাং, ঘটাং! তার পরই চোখের সামনে দেখা দিলে যে বিভীষণ মূর্তি, ভাষায় তার সঠিক বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব, কারণ তেমন সৃষ্টিছাড়া মূর্তি বর্ণনা করবার জন্যে মানুষের ভাষা সৃষ্টি হয়নি।

তার উচ্চতা সাত ফুটের কম হবে না। কেশলেশহীন গোলাকার মাথা বেড়ে রয়েছে তিনখানা চাকার মতো কি! প্রায় মানুষের মতো মুখ, কিন্তু মড়ার মতো ভাবহীন। মানুষেরই মতো দুইখানা হাত আর দুইখানা পা, কিন্তু তার আপাদমস্তক যেন অদ্ভুত এক লোহার বর্ম দিয়ে ঢাকা! আর তার সেই চোখ! সে দুটো সত্যই যেন চোখ নয়-যেন হেডলাইটের তীব্র আলো! তার সেই অতি আজব আলোক চক্ষুদুটো ঘুরে ঘুরে এদিকে-ওদিকে যে দিকে ফিরছে সেই দিকটাই হয়ে উঠছে আলোয় আলোয় আলোময়!

আমি তো অবাক! দস্তুরমতো কিংকর্তব্যবিমূঢ়! তা না হয়ে উপায়ও ছিল না। অতি ভীষণ দুঃস্বপ্নেও যা কোনওদিন কেউ কল্পনা করতে পারেনি, তাকেই দেখছি চোখের সামনে এই রাজধানী কলকাতার রাজপথে একেবারে সাকার অবস্থায়! তখনি যে মাথা ঘুরে জ্ঞান হারিয়ে চিৎপটাং হইনি, এজন্যে নিজেই আমি নিজেকে যথেষ্ট বাহাদুরি দিতে পারি।

মূর্তিটা কথা কইলে। বেয়াড়া গলায় বললে, ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ।

ভোঁ-ভো কি রে বাবা? ওর মানে কী? মূর্তির হাতে একটা বেশ বড়সড়ো মোড়ক রয়েছে, তার ভিতরেই কি আছে? ওটা গদি থেকে লুট করা কোনও চোরাই মাল নয় তো?

আমি তখনই সজাগ হয়ে চেঁচিয়ে উঠলুম, এই সেপাই! পাকড়া, পাকড়া!

ছয়-ছয়জন বলিষ্ঠ হৃষ্টপুষ্ট পশ্চিমা পাহারাওয়ালা চারিদিক থেকে ছুটে গিয়ে আক্রমণ করলে মূর্তিটাকে।

কিন্তু চোখের নিমেষে যে কাণ্ডটা হল, বললে তোমরা হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবে না। মুর্তিটা মাত্র একখানা হাত ও একখানা পা ব্যবহার করে কারুকে মারলে ঘুসি এবং কারুকে মারলে লাথি-একবারের বেশি দ্বিতীয় বার কারুকে মারতে হল না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই ছয়-ছয়জন জোয়ান পাহারাওয়ালা দারুণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠে প্রপাত ধরণীতলে! তাদের কেউ অজ্ঞান হয়ে গেল, কেউ-বা ছটফট করতে লাগল। জয়ন্ত, তোমার গায়ে যে অসুরের মতো শক্তি আছে, তার বহু প্রমাণ আমি পেয়েছি। কিন্তু সেই

মূর্তিটার পাল্লায় পড়লে তুমিও যে কিছুতেই আত্মরক্ষা করতে পারবে না, এ বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। তার যে অবিশ্বাস্য শারীরিক শক্তির প্রমাণ পেলুম, আমার তো বিশ্বাস সে একলা অনায়াসেই মত্ত মাতঙ্গের সঙ্গে লড়াই করতে পারে।

হঠাৎ মূর্তিটা ফিরে দাঁড়িয়ে আগুন-চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ওষ্ঠাধর ফাঁক করে হাসলে যেন একটা মৌন হাসি! তার পরেই তার অপার্থিব কণ্ঠের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একসঙ্গেই অনেকগুলো গলায় আশ্চর্য সব আর্ত চিৎকার–একসঙ্গেই সেই ছয়-ছয়জন পাহারাওয়ালার কণ্ঠনিঃসৃত আর্তনাদের অবিকল পুনরাবৃত্তি। অর্থাৎ যেন আবার তার গলার ভিতর দিয়ে ছয়জন পাহারাওয়ালা চেঁচিয়ে কেঁদে ককিয়ে উঠল ছয়রকম স্বরে! বিশ্বাস করো ভাই জয়ন্ত একটা কথাও আমি একটুও ভুল শুনিনি, স্বকর্ণে আর সজ্ঞানে শ্রবণ করলুম, মূর্তিটার মুখ থেকে আবার বেরিয়ে এল প্রত্যেক পাহারাওয়ালার বিভিন্ন স্বরের ক্রন্দনধ্বনি।

তিনজন পাহারাওয়ালা নিদারুণ আঘাতেও অজ্ঞান না হয়ে কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করছিল, এই আজব ব্যাপারে যন্ত্রণা ভুলে তারা সভয়ে চোখগুলো বিস্ফারিত করে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে রইল।

এই সব দেখেশুনে আমার নাড়ি যখন প্রায় ছাড়ি ছাড়ি করছে, মুর্তিটা হঠাৎ তিরের মতো দৌড়োতে শুরু করলে। তাও সাধারণ মানুষের দৌড় নয়, কারণ দৌড়োবার সময়ে আমরা যেমন দ্রুতবেগে পদচালনা করি, সে মোটেই তা করলে না। মনে হল তার দুই পায়ের তলায় আছে একজোড়া স্কেট বা তুষারপাদুকা, আর তারই সাহায্যে পা না বাড়িয়েই চো করে সে চলে গেল ফুটপাথের ওপর দিয়ে সোজা! মোড় ফিরে সে অদৃশ্য হল, তার পরই শোনা গেল একখানা চলন্ত মোটরের শব্দ। বোধহয় ওখানে মোড়ের মাথায় এতক্ষণ তারই জন্যে অপেক্ষা করছিল কোনও মোটরগাড়ি।

পরে জানা গেল, সেদিন কানহাইয়ালালের গদিতে বাহির থেকে এসেছিল মোট ষাট হাজার টাকার একশো টাকার নোট। সেগুলো একটা মোড়কের মধ্যে বাঁধা ছিল। আগে

থেকে কোনও রকম জানান না দিয়ে মূর্তিটা হঠাৎ গদির ভিতরে ঢুকে পড়ে এবং অনায়াসেই লোহার আলমারির চাবির কল ভেঙে হস্তগত করে নোটগুলো। তার অতিকায় কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি দেখেও ভয় না পেয়ে কিংবা কর্তব্যের খাতিরে বোকার মতো যারা তাকে বাধা দিতে গিয়েছে, তাদের প্রত্যেককেই পাঠাতে হয়েছে হাসপাতালে।

জয়ন্ত, মানিক, মোটামুটি এই হল আমার কাহিনি। এখন তোমাদের মতামত কি?

জয়ন্ত চুপ করে বসে বসে খানিকক্ষণ ধরে কি ভাবলে। তারপর শুধোলে, আমার প্রথম জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, ঘটনার দিন আপনার কাছে রিভলভার ছিল?

ছিল বই কী!

সেটা আপনি ব্যবহার করেননি কেন?

আরাম কেদারায় বসে এরকম প্রশ্ন করা খুবই সহজ বটে কিন্তু ঘটনাস্থলে হাজির থাকলে তুমিও আমার চেয়ে বেশি কিছু করতে পারতে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। ঘটনাগুলো বলতে এতক্ষণ লাগল কিন্তু ঘটেছিল বোধহয় মিনিট খানেকের মধ্যেই। আর সেই এক মিনিট সময় মূর্তিটাকে আর তার কাণ্ডকারখানা দেখে আমি এমন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম যে, রিভলভারের কথা আমার মনেই পড়েনি। সেটা ভূত না মানুষ না অন্য কোনও কিছু, এখনও পর্যন্ত আমি তা আন্দাজ করতে পারছি না।

আমার বিশ্বাস, আপনি রিভালভার ছুঁড়লেই সব রহস্য পরিষ্কার হয়ে যেত। যাক সে কথা– গতস্য শোচনা নাস্তি। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, সেই কালো রঙের মোটরখানার চালককে কেউ দেখেছে কি?

চালককে অনেকেই দেখেছে বটে, কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে কেউ তাকে ভালো করে দেখতে পায়নি।

সেখানা কি গাড়ি?

ফোর্ড।

নম্বর পেয়েছেন?

প্রথম ঘটনায় চিনুভাই যেদিন আহত হয়, সেইদিনই নম্বর পাওয়া গেছে। কিন্তু ভুয়ো নম্বর। সে নম্বরের কোনও গাড়ি নেই।

মুর্তিটার প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে এই : চোখ দিয়ে অতি উজ্জ্বল আলো বেরোয়। বর্মধারী। একসঙ্গে অনেকগুলো কণ্ঠস্বরে কথা কয়। নীরবে হাসে। ভেঁ-ভোঁ শব্দ করে। গোলাকার মাথা ঘিরে চাকার মতো কি তিনখানা আছে। জুতোর তলায় চাকা বা স্কেট পরে। অদ্ভুত সব বিশেষত্ব–মানুষী ভাবের সঙ্গে অমানুষী ভাবের মিল। কিন্তু মূর্তিটার মস্তিষ্ক আছে। চোখ দিয়ে দেখে, মন দিয়ে ভাবে, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করে, অনায়াসেই পুলিশকে ফাঁকি দেয়, আবার মানুষদের মধ্যে শারীরিক শক্তিতেও অতুলনীয়–ছয়-ছয়জন বলবান পাহারাওয়ালাকেও এক এক আঘাতে ভূমিসাৎ করে। আমার সামনে এক আশ্চর্য সমস্যা এনে দিলেন সুন্দরবাবু! ফস করে এ সমস্যার সমাধান করতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।

কিন্তু জয়ন্ত, যতদিন এ সমস্যার সমাধান না হয়, ততদিন কলকাতা হয়ে থাকবে একটা বিপদজনক জায়গা।

উপায় কি, অবলম্বন করবার মতো কোনও সূত্রই তো খুঁজে পাচ্ছি না। অপরাধী যদি বর্ম পরে, তবে তার আসল রূপ কেউ দেখতে পায় না, তার হাতের আঙুলের বা পায়ের ছাপেরও কোনও মূল্য থাকে না। এই বিংশ শতাব্দীতে বর্ম পরে রাহাজানি করা একটা নতুন ব্যাপার বটে। চোখ দিয়ে আগুন বার করা, হয়তো কোনও যান্ত্রিক কৌশল। কিন্তু কোনও মানুষ একসঙ্গে বহু কণ্ঠে কথা কয়, এটা কখনও শুনেছেন? আবার দেখুন, মূর্তিটা মানুষের মতো মাথা খাঁটিয়ে নিজের স্বাধীন বুদ্ধি ব্যবহার করতে পারে। আরও একটা

ব্যাপার লক্ষ করবার আছে। তিনটি ঘটনাস্থলেই মুর্তিটা বেছে বেছে আক্রমণ করেছে কেবল অবাঙালিদেরই।

এ থেকে কি বুঝতে হবে?

এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে এটা একটা উল্লেখযোগ্য সূত্র বটে। এরও দুটো দিক আছে। অপরাধী নিজেও হয়তো মারোয়াড়ি, তাই মারোয়াড়িদের হাঁড়ির খবরই ভালো করে রাখতে পারে।

কিন্তু কেবল মারোয়াড়িদের সম্পত্তিই সে লুণ্ঠন করেনি।

হ্যাঁ তাও জানি। চিনুভাই চুনীলাল হচ্ছে গুজরাটি নাম। কিন্তু সে তো অবাঙালি।

তাহলে কি মারোয়াড়িদের উপরেই আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে?

তাই-ই বা বলি কেমন করে? অপরাধী নিজে বাঙালি হতেও পারে। তাই যে সব অবাঙালি এদেশে এসে বাংলার টাকা লুণ্ঠন করছে, তাদের উপরেই তার জাতক্রোধ। তবে একটা কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। অপরাধ যাদের পেশা, সেই পুরাতন পাপীর দলে আমাদের আসামিকে খুঁজে পাব না। পুরাতন পাপীরা যে পদ্ধতিতে অপরাধ করে, আমাদের কাছে তা অজানা নেই। বর্তমান ক্ষেত্রের পদ্ধতি হচ্ছে সম্পূর্ণ নতুন। এসব রাহাজানির পিছনে কাজ করেছে কোনও সুশিক্ষিত, আধুনিক আর বৈজ্ঞানিক মস্তিষ্ক। মারোয়াড়ি মহলে এ শ্রেণির মস্তিষ্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই আমার সন্দেহ হয়, অপরাধী বাঙালি-সে বিশেষরূপে শিক্ষিত আর বিজ্ঞান নিয়ে কেবল নাড়াচাড়াই করে না, হয়তো সে সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ।

তাহলে আপাতত এই সূত্র ধরেই আমাকে কাজ আরম্ভ করতে বলো?

হ্যাঁ। তবে আরও একটা ছোট সূত্র আছে বটে কালো রঙের ফোর্ড। কিন্তু কলকাতায় ওরকম গাড়ির অধিকারীর সংখ্যা অল্প নয়, সুতরাং এখন ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই- যদিও সূত্রটা পরে কাজে লাগবে বলে মনে হচ্ছে।

সুন্দরবাবু বললেন, হুম্ এইবারে আমি চা পান করতে পারি। চায়ের সঙ্গে আর কি আছে?

আমেরিকান ব্রেকফাস্ট বিস্কুট আর এগ-টোস্ট।

চমৎকার, চমৎকার! অবিলম্বে আনয়ন করো।

পরিতৃপ্ত মুখে পানাহার করতে করতে সুন্দরবাবু বললেন, সেই দুঃস্বপ্ন হারিয়ে দেওয়া মূর্তিটাকে প্রথম যখন চোখের সামনে দেখেছিলুম, তখন আবার যে তোমার এখানে এসে চা আর এগ-টোস্ট প্রভৃতি এড়াতে পারব, সে আশায় একেবারেই দিয়েছিলুম জলাঞ্জলি।

মানিক বললে, আমি বলতে পারি, আপনি নিশ্চয়ই মূর্তিটাকে ভালো করে দেখতে পাননি।

হুম, কেমন করে জানলে?

চোখের সামনে আপনি খালি দেখেছিলেন রাশি রাশি সরষের ফুল। সে সময়ে আর কিছু দেখা চলে না।

তোমার এ অনুমান সত্য। চোখের সামনে আমি সরষের ফুল দেখেছিলুম বটে। কিন্তু সেটা কারণ নয়, কার্য। কেন না মুর্তিটাকে আরও ভালো করে দেখতে না পেলে সেদিন কখনওই স্বচক্ষে আমি সরষের ফুল দেখতে পেতুম না। বুঝলে হে নিরেট?

.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ । রাজবাড়ির ভোজ

সাতদিন কেটে গেল পরে পরে।

জয়ন্ত যখনই অবসর পায়, চোখ মুদে কি ভাবে ইজিচেয়ারে অর্ধশয়ান অবস্থায়। এই কয় দিন সে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তার নিত্য-নৈমিত্তিক ভ্রমণ পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে। রোজ সে। একবার না একবার বাঁশি বাজাই। কিন্তু তার বাঁশি এখন বোবা। খুশি হলেই নস্য নেওয়া তার স্বভাব। কিন্তু তার মেজাজ আজকাল নিশ্চয়ই খুশি নয়, কারণ এ হপ্তায় একবারও সে নস্য নেয়নি। এমনকী আহারও করে নামমাত্র। বলে, পুর্ণোদরে মস্তিষ্ক উচিতমতো কাজ করে না।

সেদিনকার সন্ধ্যা ছিল বৃষ্টিকাতর। মানিককে ডেকে জয়ন্ত বললে, দেখো, জটিল আর আশ্চর্য মামলা আমি ভালোবাসি। কিন্তু এ মামলাটার ভিতর সূত্রগুলো এমন জট পাকিয়ে আছে যে, অসম্ভবকে সম্ভবপর মনে না করলে স্থানে স্থানে একেবারেই খেই খুঁজে পাওয়া যায় না। মূর্তিটার চোখে আগুন, পায়ে চাকা আর গায়ে বর্ম আছে শুনে আমি ততটা বিস্মিত হইনি, যতটা হয়েছি একসঙ্গে সে বহু কণ্ঠে কথা কইতে পারে শুনে। এটা হচ্ছে অপার্থিব ব্যাপার, পৃথিবীর কোনও মানুষই তা পারে না। অথচ ভেবে ভেবে আমি এমন কিছু আন্দাজ করে নিয়েছি, কেউ যা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করবে না।

মানিক শুধোলে, আন্দাজটা কি, শুনতে পাই না?

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, না, আমার আন্দাজ নিয়ে তোমাকে চমকে দিতে চাই না।

কিন্তু এরকম উদ্ভট মূর্তি সম্ভবপর কিনা, সে বিষয়ে তুমি কিছু চিন্তা করেছ?

করেছি বই কী! কেবল আমি নই, পাশ্চাত্য দেশেও এবিষয় নিয়ে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ যথেষ্ট মস্তিষ্ক চালনা করেছেন।

মানিক সোৎসাহে বলে উঠল, কীরকম?

সম্প্রতি একখানা ইংরেজি কাগজে দেখলুম, কানাডার Defence Research Board এর চেয়ারম্যান ডক্টর এইচ. এম. সোল্যান্ড মতো প্রকাশ করেছেন–

তার কথায় বাধা দিয়ে বেজে উঠল টেলিফোনের ঘন্টিটা।

জয়ন্ত মুখের কথা শেষ না করেই উঠে গিয়ে রিসিভার ধরে বললে, হ্যালো! সুন্দরবাবু নাকি? কী খবর? আঁঃ, আবার অলৌকিক দস্যুর আবির্ভাব? কোথায় বললেন? রাসবিহারী অ্যাভিনিউর উপরে? কোথা থেকে ফোন করছেন? মহারাজা বাহাদুর দুর্গাপ্রসাদ সিংহের প্রাসাদ থেকে? হ্যাঁ, সে প্রাসাদ আমি চিনি। আমাকে এখনি যেতে হবে? তথাস্তু!

রিসিভার রেখে দিয়ে জয়ন্ত ফিরে বললে, সব শুনলে তো মানিক? যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হও। আমিও জামাকাপড় বদলেনি।

মানিক উঠে দাঁড়িয়ে বললে, এ কী নির্ভীক দস্যু? এখনও রাত গম্ভীর হয়নি, রাসবিহারী অ্যাভিনিউর মতো জনবহুল বড় রাস্তার উপরে

জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত বললে, না মানিক, তোমাদের ওই অলৌকিক দস্যু নির্ভীক হলেও নির্বোধ নয়। আকাশের ঘোর ঘটা, মেঘের জটা, বিদ্যুতের ছটা আর ধারাপাতের পটাপট শব্দ শুনেও কি আন্দাজ করতে পারছ না যে, কবিদের ভাষায় এখন পন্থ বিজন, তিমির সঘন? গিয়ে দেখবে রাসবিহারী অ্যাভিনিউ এখন রীতিমতো ফাঁকা জায়গা।

মোটরে বেরিয়ে তারা দেখলে, শহরের যেসব রাস্তা জনতার জন্যে বিখ্যাত, আজ হয়ে পড়েছে প্রায় জনহীন। আকাশ কালিমাখা, থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকে উঠছে, এঁকেবেঁকে সঙ্গে সঙ্গে ডেকে ডেকে উঠছে বজ্র, হেঁকে হেঁকে ছুটছে ঝোড়ো হাওয়া এবং ঝমঝম করে ঝরছে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারা। কোনও কোনও পথ আবার হয়ে উঠছে তরঙ্গময় নদীর মতো। নিতান্ত দায়ে না পড়লে মানুষ তো দুরের কথা কুকুর-শেয়ালও আজ বাইরে বেরুতে রাজি হবে না।

রাসবিহারী অ্যাভিনিউ হয়ে পড়েছে নির্জন। খরিদ্দারের অভাব দেখে দোকানদাররাও আলো নিবিয়ে দোকান বন্ধ করে সরে পড়েছে। কেবল সরকারি আলোগুলোই কলকাতার

রাস্তাকে উজ্জ্বল করে তুলতে পারে না, তাকে যথার্থরূপে সমুজ্জ্বল করে তোলে দোকানিদেরই দেওয়া সন্ধ্যাদীপ; তার অভাবে বহু স্থানেই দেখা যাচ্ছে আলো-আঁধারির লীলা! মাঝে মাঝে দেখা যায়। এক-একজন বৃষ্টিস্নাত শীতকাতর জড়সড় পথিককে, হাতে তার ছাতা আছে, কিন্তু খোলবার উপায় নেই, কারণ বোঁ বোঁ করে বইছে এমনই জোর হাওয়া যে খুললেই ছত্র উলটে গিয়ে পরিণত হবে আকাশের জলপাত্রে।

জয়ন্ত বললে, দেখছ তো মানিক, চারিদিকের অবস্থা। যে অপরাধী এমন সুযোগ ত্যাগ করে তাকে কেউ বুদ্ধিমান বলবে না।

মোটর মহারাজা দুর্গাপ্রসাদের ফটক ও বাগান পার হয়ে গাড়িবারান্দার তলায় গিয়ে দাঁড়াল! মোটরের শব্দ শুনেই বাইরে এসে সুন্দরবাবু শুধোলেন, জয়ন্ত-ভায়া নাকি?

গাড়ির গতি থামিয়ে জয়ন্ত বললে, হুঁ।

বাড়ির ভিতরে ভারি লোকের ভিড়। আমি আগে তোমার সঙ্গে গোপনে কথা কইতে চাই।

বেশ তো, গাড়ির ভিতরে আসুন না!

সুন্দরবাবু ভিতরে ঢুকে জয়ন্তের পাশে এসে বসলেন।

জয়ন্ত বললে, সমাচার?

অলৌকিক দস্যু আবার দেখা দিয়েছে, আক্রমণ করেছে-এবং পালিয়ে গিয়েছে।

পালিয়ে গিয়েছে!

হ্যাঁ, যাকে বলে দস্তুরমতো পিঠটান!

কার ভয়ে সে পালিয়ে গিয়েছে?

বন্দুকের বুলেটের ভয়ে।

কেউ বন্দুক ছুঁড়েছিল?

হ্যাঁ। তাই লুট করতে এসেও সে জুৎ করতে পারেনি।

তারপর?

বলতে গেলে গোড়ার দু-চারটে কথা খুলে বলতে হয়। মহারাজা দুর্গাপ্রসাদের প্রথম পুত্রের বিবাহ হবে মধ্যপ্রদেশের এক সামন্ত রাজার কন্যার সঙ্গে। দুর্গাপ্রসাদ তাঁর পুত্রবধূকে লক্ষ টাকা মূল্যের জড়োয়া গহনা যৌতুক দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। গহনাগুলি নির্মাণ করবার ভার পড়েছিল কলকাতায় এক বিখ্যাত রত্নজীবীর উপরে। এই পর্যন্ত হল গোড়ার কথা।

তারপর?

আজ সন্ধ্যার পর রত্নজীবী স্বয়ং সমস্ত গহনা দিয়ে প্রাসাদে আসবেন শুনে মহারাজ নিজের গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। গাড়ির ভিতরে মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারির সঙ্গে ছিল চালক আর একজন সশস্ত্র শিখ সেপাই। অলৌকিক দস্যুর কীর্তি মহারাজেরও কানে উঠেছিল, তাই এই সাবধানতা। রত্নজীবীকে দোকান থেকে তুলে নিয়ে গাড়ি ফিরে আসছিল প্রাসাদের দিকে। আজকের দুর্যোগটা দেখছ তো? এরই ভিতর দিয়ে গাড়ি যখন রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে এসে পৌঁছোয়, পথে তখন লোকজন ছিল না বললেই চলে। হঠাৎ পাশের একটা রাস্তা থেকে একখানা কালো রঙের মোটর মহারাজার গাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে গতি বন্ধ করে দেয়। পরমুহূর্তেই নতুন মোটরখানার ভিতর থেকে বাইরে লাফিয়ে পড়ে সেই অলৌকিক দস্যু, তার চেহারার নতুন বর্ণনা দেওয়ার আর দরকার নেই। বীভৎস মূর্তিটা বেগে ছুটে এল মহারাজার গাড়ির দিকে। তার অভাবিত আকৃতি দেখে শিখ সেপাইটা আমারই মতো আতঙ্কে আর বিস্ময়ে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে রইল, তার কাছে যে বন্দুক আছে একথা পর্যন্ত ভুলে গেল। চালকের অবস্থাও তথৈবচ, রত্নজীবী সভয়ে চিৎকার করে উঠলেন।

কিন্তু বাহবা দিই মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারিকে। বিপদে পড়ে তিনি উপস্থিত বুদ্ধি হারালেন না। খবরের কাগজে অলৌকিক দস্যুর কীর্তি কাহিনি পাঠ করে তিনি নাকি আগে থাকতেই সতর্ক হয়ে ছিলেন। অলৌকিক দস্যু যেই মারমুখো হয়ে গাড়ির পাশে এসে দাঁড়াল, তিনি তৎক্ষণাৎ হেঁট হয়ে পড়ে শিখ সেপাইটার প্রায় অবশ হাত থেকে বন্দুকটা ছিনিয়ে নিয়ে আক্রমণকারীকে লক্ষ করে গুলি ছুড়লেন।

কিন্তু অলৌকিক দস্যু অত্যন্ত হুঁশিয়ার ব্যক্তি, অত্যন্ত চতুর। সেক্রেটারি বন্দুকের ঘোড়া টেপবার আগেই সে চট করে গাড়ির পাশে পথের উপরে বসে পড়ল, গুলি তার গায়ে লাগল না। পরমুহূর্তেই সে নিজের আসুরিক শক্তির আশ্চর্য পরিচয় দিলে। সেক্রেটারি দ্বিতীয়বার বন্দুক ছোড়বার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, আচম্বিতে মহারাজার গাড়িখানা হুড়মুড় করে উলটে গেল, আরোহীরা ছিটকে পড়ল এদিকে ওদিকে! মানুষ শিশুদের খেলনার গাড়ি যত সহজে উলটে দিতে পারে, অলৌকিক দস্যু তেমনি অনায়াসেই গাড়িখানাকে তুলে আছড়ে ফেলে দিলে।

মাটির উপরে অতর্কিতে বিষম আছাড় খেয়ে আর জখম হয়েও সেক্রেটারি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলেন না। চোখের নিমেষে আবার তিনি উঠে পড়ে পথের উপর থেকে হস্তচ্যুত বন্দুকটা তুলে নিলেন, কিন্তু চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে অলৌকিক দস্যু লাফ মেরে নিজের কালো রঙের মোটরের ভিতরে গিয়ে ঢুকল সঙ্গে সঙ্গে গাড়িখানাও দৌড় মারলে তড়িৎ বেগে! সেক্রেটারি তবু আর একবার বন্দুক ছুড়লেন ছুটন্ত গাড়িখানাকে লক্ষ করে, কিন্তু গাড়ির গতি বন্ধ হল না।

গাড়ি থেকে বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়ে প্রত্যেক আরোহীই অল্পবিস্তর চোট খেয়েছে বটে, কিন্তু লক্ষ টাকার অলঙ্কার থেকে মহারাজাকে বঞ্চিত হতে হয়নি। তারপর রাজবাড়ি থেকে ফোন পেয়ে আমি এখানে এসেছি তদন্ত করতে।

জয়ন্ত নীরবে সব শুনে প্রথমেই বললে, দেখছেন তো সুন্দরবাবু, আপনাদের অলৌকিক দস্যু আগ্নেয়াস্ত্রকে কতখানি ভয় করে?

দেখছি তো। তা হলে ব্যাপারটা অপার্থিব নয়, পার্থিব?

পৃথিবীতে অসাধারণ ব্যাপার থাকতে পারে, অসামান্য বৈজ্ঞানিক ব্যাপার থাকতে পারে, কিন্তু অপার্থিব কোনও কিছু আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না।

তা হলে সেদিন আমি যদি রিভলভার ছুঁড়ে লক্ষ্য ভেদ করতে পারতুম, তাহলে এই অদ্ভুত ডাকাতটার হাতেনাতে ধরা পড়বার সম্ভাবনা ছিল?

তাইতো মনে হয়।

হায় হায় হায় হায়, বোকার মতো গাধার মতো খামোকা ভয় পেয়ে কত বড় গৌরব থেকে আমি বঞ্চিত হলুম!

মানিক বললে, সুন্দরবাবু, এখনও আপনি বোকার মতো গাধার মতো বকবক করছেন।

হুম্ করছি নাকি?

করছেন না তো কি? যে দুধ চলকে পড়ে গিয়েছে তা নিয়ে আবার হায় হায় করা কেন?

তা যা বলেছ। তবে কি জানো, পোড়া মন যে সহজে বোঝ মানে না।

জয়ন্ত বললে, যেতে দিন ও কথা। এখন কাজের কথা থোক। মহারাজার প্রাইভটে সেক্রেটারি দেখছি অত্যন্ত সাবধানী ব্যক্তি।

তা আবার একবার করে বলতে?

কালো রঙের ফোর্ড গাড়িখানার নম্বর দেখতে নিশ্চয়ই তিনি ভুল করেননি?

নম্বর তিনি দেখে নিয়েছেন বইকী! কিন্তু সেই ভুয়ো নম্বর।

যাক। আপনার কাছে আর কিছু নতুন তথ্য আছে?

ছোট একটি তথ্য আছে বটে, কিন্তু সেটা আমাদের কাজে লাগবে না।

তথ্যটা কী?

অনতিবিলম্বেই ঘটনাস্থলে এসে আমি একবার তদারক করে গিয়েছি। একজন সার্জেন্টের মুখে শুনলুম, ঘটনা যখন ঘটে সেই সময়ে সে রাসবিহারী অ্যাভিনিউর পাশের একটা রাস্তা দিয়ে আসছিল। হঠাৎ সে দেখতে পায় একখানা কালো রঙের ফোর্ড গাড়ি অতিরিক্ত বেগে পথের উপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। সে চেঁচিয়ে গাড়িখানা থামাতে বলে। কিন্তু চালক তার কথা গ্রাহ্যের মধ্যেও আনেনি, বরং আরও জোরে গাড়ি চালিয়ে দেয়। সার্জেন্টের সন্দেহ হয়, সে দাঁড়িয়ে পড়ে। গাড়িখানা মোড় ফিরে নিউ স্ট্রিটের ভিতর গিয়ে ঢোকে। সার্জেন্টও নিউ স্ট্রিট পর্যন্ত অগ্রসর হয়, কিন্তু গাড়িখানাকে আর দেখতে পায় না। এইটুকু তথ্য নিয়ে আমাদের কি লাভ হবে জয়ন্ত? নিউ স্ট্রিটের ভিতর দিয়ে গাড়িখানা কত দূরে গিয়ে পড়েছে কে তা বলতে পারে?

জয়ন্ত স্তব্ধ হয়ে রইল প্রায় তিন মিনিট। তার দুই চক্ষু মুদ্রিত।

সুন্দরবাবু অধীর হয়ে বললেন, কি হে, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

উঁহুঁ।

তবে?

ভাবছি।

কী ভাবছ?

আপনার এই তথ্যটি ছোট্টও নয়, সামান্যও নয়।

মানে?

সার্জেন্টের উচিত ছিল নিউ স্ট্রিটের মোড় পর্যন্ত না গিয়ে দৌড়ে তার ভিতর প্রবেশ করা।

কেন?

তাহলে খুব সম্ভব সে কোনও অত্যন্ত দরকারি সূত্র আবিষ্কার করতে পারত।

কেমন করে?

কেমন করে জানি না। তবে এটুকু জানি যে, নিউ স্ট্রিট সত্য সত্যই একটি নতুন রাস্তা। বালিগঞ্জের অনেক নতুন রাস্তার মতো এটিও এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। পূর্বদিকে খানিকটা এগুবার পর দেখা যায়, অসম্পূর্ণ রাস্তার দুই ধারে আর সামনে আছে এবড়োখেবড়ো খণ্ড খণ্ড খোলা জমি, তার উপর দিয়ে মোটর চলা অসম্ভব! নিউ স্ট্রিটের যে অংশটুকুর ভিতরে লোকের বসতি আছে, তার কোনও জায়গা দিয়েও মোটরের বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার পথ নেই। এ থেকে কি বুঝতে হবে সুন্দরবাবু?

সুন্দরবাবু কিছুক্ষণ নীরব ও চমৎকৃত হয়ে রইলেন। তারপর অভিভূতের মতো বলে উঠলেন, তুমি কি বলতে চাও জয়ন্ত? সেই কালো রঙের গাড়িখানা ছিল নিউ স্ট্রিটের ভিতরেই?

আমাকে কোনও প্রশ্ন করবেন না, প্রশ্ন করুন নিজের সহজ বুদ্ধিকেই।

হায়রে কপাল, আমরা কেল্লা ফতে করবার আর একটা মস্ত সুযোগ হারালুম!

সুন্দরবাবু, এখন আমাদের কি কর্তব্য জানেন?

হতাশভাবে বাসায় ফিরে যাওয়া।

মোটেই নয়। আমাদের এখনি বিপুল উৎসাহে নিউ স্ট্রিট বেড়াতে যাওয়া উচিত।

এই রাত্রে, এই ঝড়-জলে?

হ্যাঁ।

তুমি কি মনে করো, আমাদের হাতে ধরা পড়বার জন্যে কালো রঙের গাড়িখানা এখনও সেখানে অপেক্ষা করছে?

আমি কি মনে করি না করি তা নিয়ে আপনি মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? চলুন না, খানিকটা ঝোড়ো বায়ু সেবন করে আসি।

দুটো বাধা আছে ভায়া। প্রথমত, আমার সর্দির ধাত, ঝোড়ো ভিজে হাওয়া হয়তো সামলাতে পারব না। দ্বিতীয়ত, লাখ টাকার মাল পয়মাল হয়নি বলে মহারাজা খুশি হয়ে আজ আমাদের সকলের জন্যে ভোজের আয়োজন করেছেন। ভেবে দেখো জয়ন্ত, রাজবাড়ির ভোজ, খাদ্যতালিকা কতখানি দীর্ঘ হবার সম্ভাবনা!

তাহলে আপনি রাজবাড়িতে পুনঃপ্রবেশ করুন, আমরা দুজনেই চললুম নিউ স্ট্রিটে।

সে কী, মহারাজা বাহাদুর আমার মুখে তোমাদের কথা শুনে তোমাদেরও নিমন্ত্রণ করেছেন যে!

মানিক বললে, আমরা দীর্ঘকর্ণ নই, দীর্ঘ তালিকার লোভে রবাহুত অতিথির আসনও অধিকার করতে পারব না।

দীর্ঘকর্ণ? ঠারেঠোরে আমাকে গাধা বলে গালাগাল দেওয়া হচ্ছে? আমি গাধা?

সেটা তো একটু আগে আপনি নিজের মুখেই স্বীকার করলেন।

জয়ন্ত, মানিকের নষ্টামি অসহনীয়! চলো, আমি তোমাদের সঙ্গেই যাচ্ছি। হুম!

.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ঠিক, ঠিক, ঠিক!

ঝর-ঝর-ঝর-ঝর ঝরছে তখনও আকাশ-ঝরনা, হু-হু-হুঁ-হুঁ পড়ছে ভিজে বাতাসের এলোমেলো দীর্ঘশ্বাস। পথের ধারে ধারে রুদ্ধদ্বার বাড়িগুলো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের একটা জানলাতেও দেখা যাচ্ছে না আলো-হাসির এতটুকু আভাস। পৃথিবীকে আজ গ্রাস করেছে পরিত্যক্ত সমাধির বিজনতা!

বর্ষাতির প্রান্তগুলো ভালো করে দেহের উপরে গুছিয়ে নিয়ে সুন্দরবাবু সেই যে গুম হয়ে গাড়ির কোণ ঘেঁষে বসেছেন, মুখ দিয়ে একটিমাত্র বাক্যও উচ্চারণ করছেন না। তিনি মনে মনে কি ভাবছেন? রাজবাড়ির সুদীর্ঘ খাদ্যতালিকা? সম্ভব।

নিউ স্ট্রিট। জয়ন্ত গতি মন্থর করে গাড়িকে মোড় ফিরিয়ে বললে, মানিক, এ-রাস্তায় বাড়ি আছে মোটে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ খানা। এইবারে আমি আরও ধীরে-ধীরে গাড়ি চালাব। আমি ডানদিকে চোখ রাখি, তুমি রাখো বামদিকে। হাতে টর্চ নাও। দেখো, এ-পাড়ায় মোটর রাখবার গ্যারাজ আছে কতগুলো।

সুন্দরবাবু কানে সব শুনলেন, তবু মুখ খুললেন না।

গাড়ি পায়ে-হাঁটা পথিকের মতো আস্তে-আস্তে চলতে লাগল এবং জয়ন্ত ও মানিক টর্চ ফেলে-ফেলে প্রত্যেক বাড়ি লক্ষ করতে লাগল। মিনিট সাত এইভাবে অগ্রসর হবার পর আর কোনও বাড়ি পাওয়া গেল না। তারপরই পথ বন্ধ। মোটরের হেডলাইট ফেলে দেখা গেল, জলমগ্ন খণ্ড খণ্ড জমি। কোনও কোনও জমির উপরে নতুন নতুন বাড়ি নির্মাণের কাজ সবে শুরু হয়েছে, কোথাও খানিকটা অগ্রসর হয়েছে।

জয়ন্ত বললে, আমরা মোটে তিনটি গ্যারেজ পেলুম। চার নম্বর বাড়িতে একটা, সতেরো নম্বর বাড়িতে একটা, আটাশ নম্বর বাড়িতে একটা। মানিক, নম্বরগুলো একখানা কাগজে টুকে নিয়ে সুন্দরবাবুর হাতে দাও।

সুন্দরবাবু রাগত স্বরে বললেন, এ নিয়ে আমি কি স্বর্গে যাব?

জয়ন্ত হেসে বললে, বালাই, কেউ কী বন্ধুকে অসময়ে স্বর্গে পাঠাতে চায়? ওই তিনখানা বাড়িতে কে কে থাকে, তাদের মালিক কে, তারা কে কী কাজ করে, তাদের কী কী গাড়ি আছে, অনুগ্রহ করে এই খবরগুলো নিয়ে কাল আমার সঙ্গে দেখা করলে বাধিত হব। কেমন পারবেন কি?

অগত্যা পারতেই হবে।

চলুন, এইবারে আপনাকে রাজবাড়িতে পৌঁছে দিই। আমরা আপনার বেশি সময় নিইনি, রাজভোজ এখনও আপনার জন্যে অপেক্ষা করে আছে!

গাড়ি ফিরল। সুন্দরবাবুও জাগ্রত হয়ে উঠলেন ধীরে-ধীরে। বললেন, জয়ন্ত, তোমার কার্যপদ্ধতিটা ঠিক ধরতে পারছি না। তুমি কি বিশ্বাস করো অলৌকিক দস্যুর বাসা আছে এই রাস্তাতেই?

আমার বিশ্বাস খুব দৃঢ় নয় সুন্দরবাবু। আমি কিছু কিছু আন্দাজ করছি মাত্র। কালো গাড়ির চালক বা মালিক সার্জেন্টের চোখের সামনে নিউ স্ট্রিটের ভিতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে দূরদর্শিতার পরিচয় দেয়নি। এখান থেকে বাইরে বেরুবার আর কোনও পথ নেই। তবে সে। গেল কোথায়? খুব সম্ভব, সার্জেন্ট নিউ স্ট্রিটের মোড় পর্যন্ত পায়ে হেঁটে এসে উঁকি মারবার আগেই সে তাড়াতাড়ি গাড়ি ছুটিয়ে নিজের গ্যারাজের কাছে এসে গাড়ি তুলে ফেলেছে। এইটুকুই আমার আন্দাজ। আপাতত এর উপরেই নির্ভর করে একটু চেষ্টা করতে ক্ষতি কি? এই তো রাজবাড়ি। সাবধান সুন্দরবাবু, কাল আপনার হাতে জরুরি কাজ আছে, রাজভোজের আতিশয্যে যেন আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়বেন না!

জানি হে, জানি। ডিউটি ইজ ডিউটি।

.

পরদিন সকালে সুন্দরবাবুর দেখা পাওয়া গেল না। কিন্তু বৈকালি চায়ের আসরকে তিনি বয়কট করলেন না, হাজির হলেন একেবারে ধড়াচুড়ো পরেই।

কী সংবাদ?

অশুভ নয়। কিন্তু সারাদিন যথেষ্ট দৌড়োদৌড়ি করতে হয়েছে-উদরে শূন্যতা, কণ্ঠে মরুতৃষা। আগে কিঞ্চিৎ পানভোজনের ব্যবস্থা করো।

মানিক বললে, আজকের ব্যবস্থা মন্দের ভালো। কী কী আছে শুনবেন? পোট্যাটো স্যালাড, টি কেক, চকোলেট স্যান্ডউইচ আর চা।

বাসরে, এই কি তোমার মন্দের ভালো? এ যে ভালোর চেয়েও ভালো।

জয়ন্ত বললে, এইবারে আশ্বস্ত হলেন তো? তবে উপবেশন এবং সন্দেশ পরিবেশন করুন।

তিন ঠিকানার সন্দেশই সংগ্রহ করেছি।

যথা-

নিউ স্ট্রিটের চার নম্বর বাড়িতে থাকেন উত্তরবঙ্গের এক বিধবা জমিদার-গৃহিণী, নাম অপর্ণা দেবী। তাঁর সন্তান নেই, বিধবা ভ্রাতৃবধূর ছেলেমেয়েদের নিয়েই সংসার। ছেলেমেয়েরা সবাই নাবালক। বাড়িতে আছে চাকর, পাঁচক, দ্বারবান আর দুজন আধবুড়ো কর্মচারী। তাঁর দুখানা মোটর-একখানা অস্টিন, আর একখানা স্টুডিবেকার। নিজের বাড়ি।

তারপর, সতেরো নম্বর বাড়িতে?

ডাক্তার তপেন্দ্রনাথ দত্ত নামে এক ভদ্রলোক থাকেন। ভাড়া বাড়ি। ভালো পসার। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। স্ত্রী আছেন। একটি ছেলে, দুটি মেয়ে। বড় মেয়ের বয়স পনেরো। ছেলের বয়স এগারো। ছোট মেয়েটি আট বছরের। ডাক্তারবাবু একখানা মরিস গাড়ির অধিকারী।

এখন বাকি রইল খালি আটাশ নম্বরের বাড়ি।

ও বাড়ির মালিক মোহনেন্দু মিত্র! একেবারে নতুন বাড়ি। আট বৎসর আমেরিকায় বাস করে তিনি দেশে ফিরে এসেছেন যন্ত্রবিৎ রূপে। নিজেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বলে পরিচয় দেন। এখনও বিবাহ করেননি। বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ। বাড়িতে ঠিকে পাঁচক আর ঝি নিয়ে থাকেন। তার বাড়ির পিছনের জমিতে কারখানার মতো কি একটা আছে। তাঁর সম্বন্ধে পাড়ার লোক বিশেষ কিছু জানে না, কারণ তিনি মিশুক মানুষ নন। একখানা ফোর্ড গাড়ির অধিকারী, নিজেই গাড়ি চালান–গাড়িখানা কালো রঙের। কি হে জয়ন্ত, আর কিছু জানতে চাও?

জয়ন্ত অন্যমনস্কর মতো বললে, না, যেটুকু জেনেছি আপাতত তাইতেই কাজ চলবে। মানিক, নস্যের ডিবেটা এগিয়ে দাও তো ভাই।

মানিক জানত অতিরিক্ত খুশি হলেই জয়ন্তের দরকার হয় নস্য। ডিবেটা এগিয়ে দিলে।

ভৃত্য মধু এসে সুন্দরবাবুর সামনে একে-একে সাজিয়ে দিলে পানভোজনের পাত্র। সুন্দরবাবুর হাত ও মুখ অতিশয় ব্যস্ত হয়ে উঠল।

জয়ন্ত চুপ করে ভাবতে-ভাবতে নস্য নেয় মাঝে-মাঝে। এইভাবে যায় কিছুক্ষণ। ইতিমধ্যে শেষ হয় সুন্দরবাবুর পানাহার।

জয়ন্ত হঠাৎ উৎসাহিত কণ্ঠে বলে ওঠে, ঠিক, ঠিক, ঠিক!

কি ঠিক জয়ন্ত?

এরপর যেদিন অলৌকিক দস্যু দেখা দেবে, সেই দিনই আমরা তাকে গ্রেপ্তার করব।

.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ । অমাবস্যার রাত

কেটে যায় দিন পনেরো।

সবাই ভাবে মহারাজা দুর্গাপ্রসাদের সেক্রেটারির তৎপরতায় হাতে-হাতে ধরা পড়তে পড়তে কোনও গতিকে বেঁচে গিয়ে অলৌকিক দস্যুর দিব্যজ্ঞান লাভ হয়েছে। কারণ আজ পনেরো দিনের মধ্যে তার আর কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি। তবু পুলিশের সচেতনতার সীমা নেই। রাস্তায় কালো রঙের ফোর্ড বেরুলেই পাহারাওয়ালাদের দৃষ্টি সজাগ হয়ে ওঠে। কালো রঙের ফোর্ড, কালো রঙের ফোর্ড–সারা শহরে কুখ্যাত হয়ে উঠেছে কালো রঙের ফোর্ড।

পুলিশ অনেক কালো রঙের ফোর্ডকে রাস্তার মাঝখানে দাঁড় করিয়ে গাড়ির ভিতরে চালনা করেছে সতর্ক তীক্ষ্ণদৃষ্টি। কিন্তু কোনও গাড়ির কোনও আরোহীরই চেহারায় খুঁজে পাওয়া যায়নি কিছুমাত্র অলৌকিকতা।

প্রত্যেক বারেই অলৌকিক দস্যু দেখা দিয়েছে রাত্রিকালে। তাই রাত্রে রাস্তায় রাস্তায় পুলিশের লোক দলে ভারী হয়ে উঠেছে রীতিমতো। কালো বা সাদা বা হলদে রঙের কোনও মোটরগাড়িই আর ফঁকি দিতে পারে না তাদের কড়া পাহারাকে।

মানিক বললে, জয়ন্ত, অলৌকিক দস্যু যে আর হানা দিতে বেরোয় না, হয়তো তার মূলে আছে দুটো কারণ।

কী, কী কারণ।

প্রথম কারণ হচ্ছে, ধনবানরা সাবধান হয়ে গিয়েছে। রাত্রে বাড়ির বাইরে মূল্যবান কিছু নিয়ে আনাগোনা করে না। বাড়ির ভিতরেও তারা হানাদারকে বাধা দেওয়ার জন্যে অধিকতর প্রস্তুত হয়ে আছে।

দ্বিতীয় কারণ?

পুলিশ বড় বেশি জাগ্রত। অলৌকিক দস্যু জানে, নাগরিকদের আর পুলিশের সাবধানতা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। কিছুদিন পরে স্বাভাবিক নিয়মেই আবার তারা অন্যমনস্ক হয়ে পড়বে, তখন আবার আসবে অলৌকিক দস্যুর মাহেন্দ্রক্ষণ।

তোমার অনুমান সত্য বলেই মনে হয়। নিরাপদ ব্যবধানে বসে অলৌকিক দস্যু দিনের পর দিন গুনছে। কিন্তু যে-কোনও দিন আবার সে আচম্বিতে দেখা না দিয়ে ছাড়বে না।

.

এক অমাবস্যার রাত। চন্দ্রহারা আকাশে সে রাতেও জমে উঠেছে মেঘের পর মেঘ। অত্যন্ত গুমোট ঝড়বৃষ্টির পূর্বলক্ষণ, পথিকরা তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলে বাসার দিকে। কোথাকার একটা বড় ঘড়িতে ঢং-ঢং করে বাজল রাত দশটা।

নিউ স্ট্রিট। অসম্পূর্ণ নতুন রাস্তা, বাড়ির সংখ্যা কম, লোক চলাচলও বেশি নয়। ও অঞ্চলটা রাত দশটার সময়েই প্রায় নিঃসাড় হয়ে আসে। তখন শব্দ সৃষ্টি করে কেবল ঝিঁঝি পোকাগুলো থেকে-থেকে ডেকে উঠছে একটা-দুটো প্যাচা।

আচম্বিতে শোনা গেল একখানা মোটরগাড়ির আওয়াজ। গ্যাসের আলোতে দেখা গেল একখানা কালো রঙের ফোর্ড। রাস্তার মাঝখান থেকে সরে গেল দুটো পথচারী কুকুর।

মোটরখানা দুটো রাস্তার সংযোগস্থলে এসে মোড় ফিরতে উদ্যত হল। সহসা খুব কাছেই বেজে উঠল তীব্র স্বরে একটা বাঁশি এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন মাটি খুঁড়েই জেগে উঠল দলে দলে মানুষ–ফোর্ডে-র এপাশে-ওপাশে, সামনে পিছনে! প্রত্যেকেরই হাতে বন্দুক মিলিটারি পুলিশ!

কোথা থেকে হল সুন্দরবাবুর আবির্ভাব–তার পিছনে জয়ন্ত ও মানিক।

সুন্দরবাবু রিভলভার তুলে গর্জন করে বলে উঠলেন, এই ফোর্ড গাড়ি! দাঁড়াও! নইলে–

গাড়িখানা দাঁড়িয়ে পড়ল তৎক্ষণাৎ।

চালক ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে বললে, কে আপনারা? কী চান?

সুন্দরবাবু মুখভঙ্গি করে বললেন, কে আমরা? তাও কি মুখ ফুটে বলতে হবে? কী চাই? তাও কি বুঝতে পারছেন না?

চালক অবিচলিত কণ্ঠে বললে, বুঝেছি আপনারা পুলিশের লোক। কিন্তু আপনারা যে কি চান, সেইটেই এখনও বুঝতে পারছি না।

বটে, বটে, বটে? আমরা চাই অলৌকিক দস্যুকে? এইবারে বুঝতে পারলেন?

উঁহু!

দূর থেকেই পরম সাবধানে গাড়ির ভিতরে উঁকিঝুঁকি মারবার চেষ্টা করে সুন্দরবাবু বললেন, ওহে, তোমরা সবাই গাড়ির দরজা খুলে দেখো তো, ভিতরে কোনও বেটা ধুমসো দুশমন হুমড়ি খেয়ে লুকিয়ে বসে আছে কিনা? কিন্তু খুব হুশিয়ার! সবাই বন্দুক তৈরি রেখো হুম, বড় বড় ধড়িবাজ আসামি!

অনেকগুলো তীক্ষ্ণদৃষ্টি গাড়ির ভিতরটা ভালো করে অন্বেষণ করলে, কিন্তু কোনও কিছুই হল না দৃষ্টিগোচর। চালক ছাড়া গাড়ির ভিতরে নেই দ্বিতীয় ব্যক্তি।

চালক সকৌতুকে বললে, কলকাতার পুলিশ কি আজকাল অলৌকিক স্বপ্ন দেখবার ব্যবসা ধরেছে?

তার ব্যঙ্গোক্তি গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে সুন্দরবাবু একবার ফিরে জয়ন্তের মুখের পানে তাকালেন। কিন্তু তার সঙ্গে তাঁর দৃষ্টি বিনিময় হল না, কারণ জয়ন্ত তখন একান্ত নির্বিকারের মতো ঊর্ধ্বমুখে অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে যেন বর্ষণোন্মুখ ও চলিষ্ণু মেঘগুলোকে দেখবার চেষ্টা করছিল। তিনি হতাশ ভাবে ফিরলেন মানিকের দিকে।

মানিক নিজের পকেটে হাত পুরে দিয়ে বললে, সুন্দরবাবু, আসবার সময়ে আপনার জন্যে চকোলেট এনেছি। দু-একটা খাবেন?

.

মনে মনে রেগে আগুন হয়ে সুন্দরবাবু আবার ফিরলেন মোটরচালকের দিকে। শুধোলেন, আপনার নাম কী?

শ্রীমোহনেন্দু মিত্র।

কী করেন?

আমি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার।

ঠিকানা?

আটাশ নম্বর নিউ স্ট্রিট।

আপনার গাড়ির নম্বর কত?

মোহনেন্দু নম্বর বললে।

আপনার লাইসেন্স দেখি।

লাইসেন্সেও পাওয়া গেল মোহনের নাম ও গাড়ির নম্বর।

কোনও দিকেই কিছু জুৎ করতে না পেরে সুন্দরবাবু অবশেষে বললেন, গাড়ি নিয়ে আপনি এখন কোথায় যাচ্ছিলেন?

বেড়াতে।

এখুনি ঝড় উঠবে, বৃষ্টি পড়বে। এই কি বেড়াতে যাবার সময়?

আমার খুশি। নির্বোধের মতো প্রশ্ন করবেন না। দয়া করে পথ ছাড়বেন কি?

হুম, না!

না মানে?

আমি আপনার বাড়ির ভিতরে খানাতল্লাশ করব।

আপনার কাছে সার্চ-ওয়ারেন্ট আছে?

আছে।

আগে আমি দেখতে চাই।

সুন্দরবাবু পকেটে হাত দিতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ জয়ন্ত তার হাত চেপে ধরে বললে, সুন্দরবাবু, আজ আর বাড়ি খানাতল্লাশ করতে হবে না। মোহনেন্দুবাবু বেড়াতে যেতে চান, ওঁকে বেড়াতে যেতে দিন।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন সুন্দরবাবু।

মোহনেন্দু বললে, তাহলে আমি গাড়িতে স্টার্ট দিতে পারি?

জয়ন্ত পায়ে পায়ে গাড়ির ঠিক পিছন দিকে গিয়ে দাঁড়াল।

হতভম্বের মতো তার চালচলন লক্ষ করতে করতে সুন্দরবাবু বললেন, বেশ মোহনেন্দুবাবু, আজ আপনার যেখানে খুশি বেড়াতে যেতে পারেন।

মোহনে গাড়িতে স্টার্ট দিলে এবং পরমুহূর্তে জয়ন্ত সুকৌশলে নিজের দেহকে সংলগ্ন করে ফেললে মোটরের পশ্চাদভাগে। তাকে সেই অবস্থায় নিয়ে গাড়িখানা বেগে বেরিয়ে গেল। সুন্দরবাবু নিজের টাক চুলকোতে চুলকোতে বললেন, এ আবার কী কাণ্ড রে বাবা!

মানিক বললে, ভালো সেনাপতি শত্রুপক্ষের প্ল্যান দেখে নিজের প্ল্যান স্থির করে। জয়ন্ত বুঝে নিয়েছে মোহনেন্দু তার প্ল্যান বদলে ফেলেছে, তাই সেও নিজের প্ল্যান বদলাতে চায়।

জয়ন্ত কেমন করে বুঝলে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

এইজন্যেই তো আপনার নাম সুন্দরবাবু আর জয়ন্তের নাম জয়ন্ত। সুন্দরবাবু যা বুঝতে পারেন না, জয়ন্ত তা বুঝতে পারে।

জয়ন্ত কি বুঝেছে তুমি তা জানো?

ঠিক জানি না বটে, তবে আন্দাজ করতে পারি কিছু কিছু!

আন্দাজটা শুনি!

মোহনেন্দু ধূর্ত ব্যক্তি। যেমন করেই হোক সে বুঝতে পেরেছে, পুলিশের নজর তার উপরে। অলৌকিক দস্যুর সঙ্গে তার কি সম্পর্ক, সেটা আমরা জানি না বটে, তবে এই নিউ স্ট্রিটের বাড়ি থেকে তাকে যে সে সরিয়ে ফেলেছে, এতে আর কোনও সন্দেহ নেই। আজ তার বাড়ি খানাতল্লাশ করলে নিশ্চয়ই আমরা কিছুই আবিষ্কার করতে পারতুম না।

মোহনের গাড়ির ভিতরে অলৌকিক দস্যু নেই। তার গাড়ির নম্বর ভুয়ো নয়। মানিক, আমরা বোধহয় ভুল সূত্র ধরে বোকা বনে গেলুম। মোহনের সঙ্গে অলৌকিক দস্যুর সম্পর্ক নেই।

আমার কি বিশ্বাস জানেন? পুলিশের নজর তার উপরে আছে কিনা এটা নিশ্চিতরূপে জানবার জন্যেই মোহনেন্দু এমন অসময়ে নিজের গাড়ি বার করেছিল।

হতেও পারে, না হতেও পারে। কিন্তু ওর গাড়ির পিছনে অমন গোঁয়ারের মতো চড়ে জয়ন্ত আজ নিজের জীবন বিপন্ন করতে চায় কেন?

ঠিক বলতে পারি না। খুব সম্ভব জয়ন্তের সন্দেহ হয়েছে, মোহনেন্দু এই ফাঁকে অলৌকিক দস্যুর সঙ্গে দেখা করে আসতে পারে।

নতুন কোনও ঠিকানায় গিয়ে?

হ্যাঁ।

হুম!

.

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। কালো রঙের ফোর্ড

তারপর কেটে গেল এক মাস।

দেড় মাসের মধ্যে একবারও অলৌকিক দস্যুর সাড়া শব্দ না পেয়ে আস্কস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল কলকাতা শহর। অনেকেই মত প্রকাশ করলে, মহারাজা দুর্গাপ্রসাদের প্রাইভেট সেক্রেটারির বন্দুকের দ্বিতীয় গুলিটা নিশ্চয়ই ব্যর্থ হয়নি, অলৌকিক দস্যু পটল তুলেছে।

কিন্তু জয়ন্তের ধারণা অন্যরকম। সে আজ এক মাস ধরে সুরেন রায় রোডে তার এক ধনী বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে, সঙ্গে আছে মানিক। আজ এক মাসের মধ্যে তারা এই বাড়ির বাইরে পা বাড়ায়নি।

ও-ফুটপাথের একখানা মাঝারি আকারের লাল রঙের দোতলা বাড়ির উপরে সর্বদাই নিবদ্ধ থাকে তাদের দৃষ্টি। এক মাস কেটে গেছে, তবু একটুও কমেনি তাদের দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা।

অথচ তারা সন্দেহজনক কিছুই দেখতে পায়নি। ও-বাড়ির ভিতরে কেউ বাস করে বলেও মনে হয় না, কারণ বাড়ির সমস্ত দরজা-জানলা সর্বদাই বন্ধ থাকে। রাত্রেও সেখানে দেখা যায় না কোনও আলোক চিহ্ন, পাওয়া যায় না কোনও মানুষের সাড়া।

কেবল মাঝে-মাঝে কোনও-কোনও দিন সন্ধ্যার পর একখানা কালো রঙের ফোর্ড গাড়ি বাড়ির সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। একটি লোক গাড়ি থেকে নেমে নিজের চাবি দিয়ে দরজার তালা খুলে বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢোকে। খানিকক্ষণ পরে আবার সে বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে চলে যায়।

সার্চ-ওয়ারেন্ট এনে বাড়িখানার ভিতরে প্রবেশ করবার জন্যে একাধিক বার উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন সুন্দরবাবু।

তাঁকে নিরস্ত করে জয়ন্ত বলছে, অলৌকিক দস্যু ওখানে আছে কিনা তাও জোর করে বলতে পারি না। আমরা খালি দেখেছি মোহনেন্দুকে আসা-যাওয়া করতে। সে যে অলৌকিক দস্যু নয়, এও আমরা সকলেই জানি। সে একবার আমাদের বোকা বানিয়েছে, আমি দ্বিতীয় বার আর ঠকতে রাজি নই। কারণ এখনও আমরা পিছু ছাড়িনি জানলে পাখি ভয় পেয়ে একেবারেই উড়ে পালাবে। তার চেয়ে ওকে নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যে কিছুদিন সময় দিন, তাহলেই আমরা কেল্লা ফতে করতে পারব।

কিন্তু আমি যে আর কৌতূহল দমন করতে পারছি না।

সবুর করুন, সবুর করুন–সবুরে মেওয়া ফলে জানেন তো? এ-বাড়িতে ফোন আছে, যথাসময়েই আপনি খবর পাবেন।

সুন্দরবাবু অপ্রসন্ন মুখে বললেন, আজ এক মাস তোমরা বাড়ি ছাড়া। আজ এক মাস তোমাদের লোভনীয় চায়ের আসর আর বসেনি। তোমরা যেন এখানেও চা-টা উড়িয়ে মজা করছ, কিন্তু আমি আসতে চাইলেই তোমরা হাঁ-হাঁ করে ওঠো!

অবুঝ হবেন না দাদা! আপনার মতো সুপরিচিত পুলিশ কর্মচারী এ-পাড়ায় ঘন ঘন আনাগোনা করলে আমাদের অজ্ঞাতবাস করা একেবারেই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

.

ঢং ঢং করে বাজল রাত বারোটা।

সুন্দরবাবু ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে বললেন, এতদিনে কি সময় হল জয়ন্ত?

বোধ হয় হল। আজ কালো গাড়িখানা একবার দুপুরে, আর একবার বৈকালে এসেছিল। তারপর আধ ঘণ্টা আগে আবার এসে দাঁড়িয়ে আছে। আসবার সময়ে লাল বাড়ির সামনে আপনিও গাড়িখানা দেখেছেন তো?

তা আবার দেখিনি! আরও একটা জিনিস লক্ষ করেছি।

কী?

গাড়িতে মোহনেন্দুর গাড়ির নম্বর নেই! তার মানে ভুয়ো নম্বর।

এত রাত্রে মোহনেন্দুর এখানে আগমন, গাড়িতে ভুয়ো নম্বর, আজ একটা কোনও ঘটনা ঘটবেই। চলুন, আমরা নীচে নেমে সদর দরজার পাশে গিয়ে লুকিয়ে থাকি। আপনার লোকজন?

সব যথাস্থানে ঘাপটি মেরে আছে।

চলুন।

কিন্তু আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না।

লাল বাড়ির ভিতর থেকে প্রথমে বেরিয়ে এল একটা ছায়ামূর্তি। সে গাড়ির চালকের সামনে উঠে বসতেই দেখা গেল আর একটা বৃহত্তর ছায়ামূর্তি। রাতের অন্ধকারে কোনও

মূর্তিকেই স্পষ্ট করে বোঝা গেল না। দ্বিতীয় মূর্তি গাড়ির ভিতরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই জাগ্রত হয়ে উঠল ইঞ্জিনের শব্দ–

এবং সঙ্গে-সঙ্গে বাজল পুলিশের বাঁশি, চারিদিকে, দপদপিয়ে উঠল অনেকগুলো টর্চ, ধেয়ে এল দলে দলে সশস্ত্র লোক!

সুন্দরবাবু গাড়ির দিকে ছুটতে ছুটতে চিৎকার করে বললেন, থামাও গাড়ি!

কিন্তু গাড়িখানা থামল না, সাঁৎ করে উল্কাগতিতে সকলের চোখের সামনে দিয়েই ছুটে বেরিয়ে গেল।

বন্দুক ছোড়, বন্দুক ছোড়ো!

সেপাইরা গুলিবৃষ্টি করলে, কোনও গুলি গাড়ির গায়ে লাগল কিনা বোঝা গেল না, কিন্তু তার গতি বন্ধ হল না। তারপর ডানদিকে মোড় ফিরে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়িখানা।

সুন্দরবাবু প্রাণপণে গলা চড়িয়ে বলে উঠলেন, আমাদের গাড়ি আছে ওরাস্তায়। শিগগির এখানে নিয়ে এসো!

কিন্তু পুলিশের গাড়ি নিয়ে এসে আবার সেই পলাতক গাড়ির সন্ধানে যাত্রা করতে মিনিট চার সময় কেটে গেল।

মানিক হতাশ ভাবে বললে, মিছেই এই ছুটোছুটি। আর মোহনের পাত্তা পাওয়া অসম্ভব। চোখের সামনে পেয়েও যাকে ধরা গেল না, চোখের আড়াল থেকে তাকে কি আর খুঁজে পাওয়া যায়?

জয়ন্ত বললে, তবু হাল ছাড়া উচিত নয়।

পুলিশের গাড়িও মোড় ফিরে ধরলে ডানদিকের রাস্তা। শূন্য পথ সিধে চলে গিয়েছে, দুইপাশে তার দাঁড়িয়ে রয়েছে আলোকস্তম্ভগুলো বোবা সাক্ষীর মতো! একান্ত স্তব্ধ রাত্রেও দূর থেকে অন্য কোনও গাড়িচলার শব্দ পর্যন্ত ভেসে আসছে না!

সুন্দরবাবু আপশোশ করতে লাগলেন, হা রে আমার পোড়া কপাল! এ কী আসামি রে বাবা! হাতে পেয়েও হাতে পাওয়া যায় না, পারার মতো পিছলে পালায়।

তবু পুলিশের গাড়ি ছোটে। ঘুমন্ত গৃহস্থদের সুখস্বপ্ন ভেঙে দিয়ে ছোটে আর ছোটে যেন কোনও অদৃশ্য আলেয়ার উদ্দেশে।

প্রায় মাইলখানেক পরে গাড়িখানা এসে পড়ল একটা তেমাথায়। এবং বাঁ-দিকের রাস্তার উপরে তাকিয়েই দেখা গেল দাঁড়িয়ে রয়েছে একখানা কালো রঙের ফোর্ড গাড়ি।

সুন্দরবাবু চেঁচিয়ে বললেন, হুম!

ফোর্ডের ভিতর থেকে প্রশান্ত স্বরে কে বললে, আপনাদের শুভাগমনের জন্যেই আমি অপেক্ষা করছি!

কে আপনি?

আমি মোহনেন্দু।

সুন্দরবাবু উচ্চকণ্ঠে বললেন, সবাই গাড়িখানা ঘিরে ফ্যালো! বন্দুক উঁচিয়ে রাখো! আবার যেন কলা দেখিয়ে চম্পট না দেয়!

আজ্ঞে না, চম্পট আমি দেব না।

দেবে না মানে? এইমাত্র তো চম্পট দিয়েছিলে!

মোটেই নয়। আপনাদের সঙ্গে একটু মজা করেছি মাত্র।

পুলিশের সঙ্গে মজা?

আপনাদের দেখিয়ে দিলুম যে, ইচ্ছা করলেই আমি পালাতে পারতুম, কিন্তু আমি পালালুম না। কেন আমি পালাব? কোনও দোষ করিনি, আমি পালাব কেন বলতে পারেন?

বলতে পারি অনেক কিছুই, আর তোমাকেও বলতে হবে অনেক কথাই। এখন তুমি গাড়ির ভিতর থেকে সুড়সুড় করে নেমে এসো দেখি। তোমার সঙ্গে যে আছে, তাকেও নামতে বলো।

গাড়ি থেকে নেমে পড়ে মোহনেন্দু বললে, আমার সঙ্গে আর কেউ নেই।

আলবত আছে! আমরা স্বচক্ষে গাড়ির ভিতরে আর একটা লোককে উঠতে দেখেছি।

ভুল দেখেছেন। গাড়িতে আমি একা।

তৎক্ষণাৎ গাড়ির ভিতরে খোঁজাখুঁজি হল। কিন্তু আর কারুকেই পাওয়া গেল না।

সুন্দরবাবু ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, দেখো মোহনেন্দু, তোমার এই চালাকি একটা শিশুকেও ভোলাতে পারবে না। আমাদের চোখের আড়ালে তুমি পালিয়ে এসেছ আসল আসামিকে সরিয়ে ফেলবার জন্যেই।

মোহনেন্দু নির্বিকার ভাবে বললে, কে আসল আসামি, আর কে নকল আসামি তা নিয়ে আপনারা যত খুশি মাথা ঘামাতে পারেন। কিন্তু এইটুকু জেনে রাখুন, আমার গাড়িতে আর কেউ ছিল না।

নেই বললেই সাপের বিষ থাকে না নাকি! আমরা তাকে দেখেছি।

বলছি তো ভুল দেখেছেন।

না, ঠিক দেখেছি।

যাকে দেখেছেন আগে তাকে এনে হাজির করুন। নইলে পুলিশের মুখের কথা আদালতেও প্রমাণ বলে গ্রাহ্য হবে না।

বেশ, আর একটা কথার জবাব দাও। তোমার গাড়িতে ভুয়ো নম্বর কেন?

এ প্রশ্নের অর্থ বুঝলুম না।

উত্তম, বুঝিয়ে দিচ্ছি। সুন্দরবাবু গাড়ির পিছন দিকে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, বটে, বটে? মোহনেন্দু তুমি কাজের ছেলে বটে! ভুয়ো নম্বরের প্লেটখানাও এই ফাঁকে সরিয়ে ফেলেছ দেখছি যে! কিন্তু একটু আগেই সেটাও আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

কলকাতার পুলিশ আজকাল যে এত ভুল দেখে, এ খবর আমার জানা ছিল না। মোহনের কণ্ঠে শ্লেষের আভাস।

সুন্দরবাবু বললেন, যাক ওসব কথা। এখন তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

কেন?

কেন, পরেই বুঝতে পারবে।

আপনি কি আমাকে গ্রেপ্তার করতে চান?

না। তবে পরে করলেও করতে পারি।

কী অপরাধে?

যদি গ্রেপ্তার করি, পরে শুনতেই পাবে।

দেখছি আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করে আমি ভালো কাজ করিনি।

অপেক্ষা করেছিলে কি সাধে? ভেবেছিলে সেদিনের মত আজকেও তোমার কথা শুনে আমরা বোকার মতো আবার তোমাকে ছেড়ে দেব। একই চালে বার বার বাজিমাত করা যায় না বাপু!

আমি নিরপরাধ।

বেশ তো, তাহলে তোমার ভয়টা কীসের? এসো এখন আমাদের সঙ্গে।

.

সপ্তম পরিচ্ছেদ। আবার ভোঁ-ভোঁ

পরদিন। প্রাতঃভ্রমণের নিত্যনৈমিত্তিক কর্তব্য পালন করে বাড়ির দিকে ফিরে এল জয়ন্ত এবং মানিক। তারা প্রত্যহই সূর্যোদয়ের আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে, তারপরে গঙ্গার ধারে বেশ খানিকক্ষণ পদচালনা করে ফিরে আসে আবার সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই। এ সময়টায় জয়ন্ত গুরুতর কোনওকিছু নিয়েই আলোচনা করতে রাজি হয় না, অন্ধকারের মধ্যে শিশু আলোকের ক্রমবিকাশ দেখতে-দেখতে এবং স্নিগ্ধ প্রভাত সমীরণকে নিশ্বাসের সঙ্গে-সঙ্গে পরমানন্দে গ্রহণ করতে করতে নিজের মস্তিষ্কে সম্পূর্ণভাবে বিশ্রাম দিতে চায়।

কিন্তু সেদিন বাড়ির কাছে এসেই তারা সবিস্ময়ে দেখলে, এত ভোরে সদরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একখানা সুপরিচিত মোটরগাড়ি।

জয়ন্ত বললে, কী আশ্চর্য! ওখানা সুন্দরবাবুর গাড়ি বলে মনে হচ্ছে না?

মানিক বললে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি।

এত সকালে সুন্দরবাবু তো কোনও দিনই বিছানার মায়া ত্যাগ করেন না।

নিশ্চয় আবার কোনও অঘটন ঘটেছে!

কী অঘটন ঘটতে পারে? মোহনেন্দু কি পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে আবার অদৃশ্য হয়েছে?

কিংবা এ-ও হতে পারে, অলৌকিক দস্যু আবার দৃশ্যমান হয়েছে।

দেখা গেল কৌচের উপরে অর্ধশয়ান অবস্থায় সুন্দরবাবুকে। তার দুই নেত্র মুদিত এবং থেকে থেকে স্ফীত হয়ে উঠছে তাঁর নাসারন্ধ্র-বোধহয় গর্জন করে উঠবে অবিলম্বেই।

কিন্তু আজ সুন্দরবাবু শ্রবণ-বিবর নিশ্চয়ই অত্যন্ত জাগ্রত। কারণ তাঁর নাসিকাকে গর্জন করবার কোনও অবসরই তিনি দিলেন না, জয়ন্ত ও মানিকের পদশব্দ শুনেই দুই চোখ মেলে ধড়ফড় করে সোজা হয়ে উঠে বসলেন।

জয়ন্ত শুধোলে, ব্যাপার কী সুন্দরবাবু? সকাল হতে না হতে সর্বাগ্রে জাগে কাক আর শালিখ পাখিরা। আপনি কি আজ তাদেরও আগে নিদ্রাদেবীকে তাড়িয়ে দিয়ে এখানে এসে হাজির হয়েছেন?

সুন্দরবাবু মুখব্যাদান করে হাই তুলতে তুলতে বললেন, নিদ্রাদেবীকে তাড়াব কি, তাঁকে কাল আমাকে একেবারেই বয়কট করতে হয়েছে, বুঝেছ ভায়া? কাল তিনি আমার কাছে ঘেঁষতে পারেননি। এতক্ষণ পরে তোমার এখানে আমাকে একা পেয়ে তিনি আমার উপরে মন্ত্রশক্তি প্রয়োগ করবার চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু তার সে চেষ্টাও ব্যর্থ করে দিয়েছে তোমাদের পদশব্দ-হুম! বুঝলে?

মানিক বললে, কিছুই বুঝলুম না। নিদ্রাদেবীর বিরুদ্ধে আপনার এই অভাবিত বিদ্রোহের কারণ কী?

কারণ কী? কারণ কী? শোনো তবে বলি। কাল তোমরা দুজনে তো চলে গেলে! আমি মোহনেন্দুকে লকআপে রাখবার ব্যবস্থা করে থানা থেকে যখন বেরিয়ে এলুম রাত তখন চারটে বাজে। হঠাৎ দেখি একখানা মোটরগাড়ি থানার সামনে এসে থেমে পড়ল এবং একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক ব্যস্তসমস্তভাবে গাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন। তেমন

অসময়ে তার আবির্ভাব দেখে আমার মন কৌতূহলী হয়ে উঠল। ফিরে দাঁড়িয়ে তার আগমনের কারণ। জিজ্ঞাসা করলুম।

প্রথমেই তিনি বলে উঠলেন, অলৌকিক দস্যু, অলৌকিক দস্যু!

শুনেই আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল আমার শ্রমক্লান্ত দেহ। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলুম, অলৌকিক দস্যু কি মশাই?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই অলৌকিক দস্যু। আমি খবরের কাগজে তার চেহারার আর কার্যকলাপের বর্ণনা পড়েছি। এ অলৌকিক দস্যু না হয়ে যায় না! তারপর ভদ্রলোক যেসব কথা বলতে লাগলেন তা অত্যন্ত অসংলগ্ন। বুঝলুম দারুণ আতঙ্কে তিনি বিহ্বল হয়ে পড়েছেন, ভালো করে গুছিয়ে কিছু বলতে পারছেন না। খানিকক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হয়ে তিনি যা বললেন, সংক্ষেপে তার সারমর্ম এই :

ভদ্রলোকের নাম বসন্ত চৌধুরী, চব্বিশ পরগনায় তার জমিদারি আছে, বাস করেন টালিগঞ্জে। গত লগ্নে তিনি পুত্রের বিবাহ দিয়েছেন, কাল ছিল বউভাতের রাত। সেই উপলক্ষ্যে তার বাড়ির সামনেকার খোলা জমিতে মেরাপ বেঁধে নাট্যাভিনয়ের আয়োজন হয়েছিল।

রাত্রি আড়াইটার পর আসর ভাঙে। অতিথিদের বিদায় দিয়ে আলো-টালো নিবিয়ে অন্যান্য কাজ চুকোতে-চুকোতে সাড়ে তিনটে বেজে যায়। চারিদিক যখন নিরালা হয়ে পড়ল, বসন্তবাবু মণ্ডপ ছেড়ে বাড়ির ভিতর ঢুকব-ঢুকব করছেন, এমন সময়ে হঠাৎ শুনতে পেলেন ঘটাং-ঘটাং করে কেমন একটা ধাতব শব্দ! তার বাড়ির পাশেই খানিকটা জঙ্গলভরা বেওয়ারিশ জমি ছিল, শব্দ আসছে সেইদিক থেকেই।

অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বসন্তবাবু একটা লণ্ঠন হাতে করে সেইদিকে গিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে যা দেখলেন, তাতে তার বুকের রক্ত যেন জল হয়ে গেল। একটা প্রায় সাত ফুট লম্বা

দানবের মতো মূর্তি–দুই চক্ষে তার স্থির বিদ্যুতের মতো তীব্র অগ্নিশিখা–সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

বীভৎস মূর্তিটা তখনও তাঁকে দেখতে পায়নি। তিনি তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে এলেন। তাকে অলৌকিক দস্যু বলে চিনতে তাঁর একটুও বিলম্ব হল না, তিনি ধরে নিলেন। সে এখানে এসেছে তারই বাড়ি আক্রমণ করবার জন্যে। তাই তিনিও কালবিলম্ব না করে থানায় খবর দিতে এসেছেন।

জয়ন্ত, আসল ব্যাপারটা আমি অনায়াসেই আন্দাজ করতে পারলুম। মোহনেন্দুর গাড়ি থেকে পুলিশের ভয়ে নেমে পড়ে অলৌকিক দস্যু ওই জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে লুকিয়েছিল। আমি তৎক্ষণাৎ দলবল নিয়ে ছুটে গেলুম ঘটনাস্থলে। কিন্তু আবার হল সেই লাভে ব্যাং, অপচয়ে ঠ্যাং–পেলুম অশ্বডিম্ব, নষ্ট হল গোটা রাতের ঘুম, অলৌকিক দস্যু ফাঁকি দিলে আবার আমাকে। তারপর এই খবরটা দেওয়ার জন্যেই আমার এখানে আগমন। এখন কী করা যায় বলো তো ভায়া। শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়–কিন্তু তারও সহ্যশক্তির একটা সীমা আছে তা? পুলিশে চাকরি নিয়েছি বলে আহার-নিদ্রা তো একেবারে ত্যাগ করতে পারি না। একটা কিছু বিহিত করতেই হবে–কিন্তু কী করতে হবে বলো দেখি?

জয়ন্ত বললে, আপাতত চা-চর্চা করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না কি?

তা যেন করলুম, কিন্তু তারপর?

তারপর হাত-পা গুটিয়ে অপেক্ষা করুন।

কীসের অপেক্ষা?

অলৌকিক দস্যুর জন্যে।

সাত ঘাটের জল খেয়ে, আহার নিদ্রা ভুলে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, এত সাধ্যসাধনা করেও যার নাগাল পাচ্ছি না, তার জন্যে অপেক্ষা করব?

হাঁ। অলৌকিক দস্যুর দেখা পাবেন খুব শীঘ্রই। হয় আজ, নয় কাল, নয় পরশু।

তাই কি তুমি মনে করো?

নিশ্চয়ই! তার পক্ষে আশ্রয়হীনের মতো পথে-পথে ঘুরে বেড়ানো অসম্ভব। তার কথা সারা শহরে রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছে। যারা তাকে দেখেনি তারাও তার মূর্তির বর্ণনা পড়ে তাকে চিনে ফেলবে–যেমন চিনে ফেলেছেন বসন্তবাবু। তাকে যেখানে তোক আশ্রয় নিতে হবেই। তার দুটো ঠিকানাই আমরা জানি। এক আটাশ নম্বর নিউ স্ট্রিট। সেখানে গুপ্তচর মোতায়েন করা আছে তো?

নিশ্চয়!

তার আর এক বাসা আছে সুরেন রায় রোডে কাল যেখান থেকে সে হানা দিতে বেরিয়েছিল।

সেখানেও পাহারা মোতায়েন করা আছে।

তবে আর কি, মাভৈঃ! এখন আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি। ও মধু, ওহে শ্রীমধুসূদন! তুমি এখন আমাদের যে কার্যে নিযুক্ত করবে, আমরা খুশি মনে তাই-ই করব। দাও মধু, চা দাও, খাবার দাও।

সঙ্গে সঙ্গে চা ও খাবার নিয়ে মধুর প্রবেশ। এমন সদাপ্রস্তুত ভৃত্য দুর্লভ।

গতকল্য নিদ্রা ত্যাগ করে আজ সুন্দরবাবুর পানাহার গ্রহণ করবার প্রবৃত্তিটা বেড়ে উঠেছে অত্যন্ত। পরমাগ্রহে গ্রহণ ও গলাধঃকরণ করলেন পাঁচটা সিদ্ধ ডিম, আটখানা গোল্ডেন পা বিস্কুট, ছয়খানা টোস্ট, দুটো ল্যাংড়া আম, চারটে মর্তমান কলা ও তিন পেয়ালা চা। জয়ন্ত

ও মানিক প্রত্যেকেই খেলে কেবল একটা করে সিদ্ধ ডিম, দুখানা করে টোস্ট ও এক এক পেয়ালা চা।

তারপর সুন্দরবাবু পরিতৃপ্ত বদনে পা ছড়িয়ে বসে একটা সিগার ধরাবার উপক্রম করছেন, সহসা টেলিফোন যন্ত্রের ঘন্টি বেজে উঠল ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং।

জয়ন্ত উঠে গিয়ে রিসিভার কানে দিয়ে শুধোলে, হ্যালো, কাকে চান? সুন্দরবাবুকে? হ্যাঁ, তিনি এখানেই আছেন, ডেকে দিচ্ছি। ধরুন। ফিরে বললে, সুন্দরবাবু, থানা থেকে আপনাকে ডাকছে।

সুন্দরবাবু মুখ ব্যাজার করে বললেন, স্থান নেই, কাল নেই, দু-দণ্ড পা ছড়িয়ে জিরুবার যো নেই-কেবলই ডাকাডাকি। আর পারি না বাবা, হুম! তারপর গাত্রোত্থান করে ফোন ধরেই তাঁর মুখের উপরে ফুটে উঠল বিরক্তির বদলে মহা বিস্ময়ের ভাব।

সচকিত কণ্ঠে বললেন, আঁঃ, কী বললে?...আচ্ছা, আচ্ছা, এখুনি যাচ্ছি। তোমরা এখুনি অকুস্থলে যাও-বাড়িখানা চারধার থেকে ঘেরাও করে রাখো হা, ভালো কথা। মোহনেন্দুকেও সঙ্গে করে নিয়ে যেতে ভুলো না।

রিসিভারটা যথাস্থানে স্থাপন করে উৎসাহিত কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন, জয়ন্ত তোমার অনুমান যে এত শীঘ্র সফল হবে তা আমি ভাবতে পারিনি। যাক সে কথা, এখন তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো, সব কথা হবে গাড়িতে।

বাইরে এসে গাড়িতে উঠে জয়ন্ত বললে, বুঝেছি। অলৌকিক দস্যু আবার দেখা দিয়েছে।

হ্যাঁ।

কোন বাড়িতে?

সুরেন রায় রোডে।

তারপর?

এবারে সে প্রায় একটা নরহত্যা করেছে।

কীরকম?

আজ সকালে পাহারা বদলের সময়ে দেখা যায় রাতের পাহারাওয়ালা বাড়ির দরজার সামনে রক্তাক্ত দেহে মূর্জিত হয়ে পড়ে রয়েছে। তাকে তখনই হাসপাতালে পাঠানো হয়, কিন্তু

সে বাঁচবে কিনা সন্দেহ।

আর অলৌকিক দস্যু?

তাকে কেউ চোখে দেখেনি বটে, কিন্তু সে ওই বাড়ির ভিতরেই আছে।

কী করে বুঝলেন?

মোহনেন্দু কাল বাড়ি থেকে বেরুবার সময় সদর দরজার তালা দিয়েছিল। আজ সকালে সেই তালাটা পাওয়া গিয়েছে ভাঙা অবস্থায়, পাহারাওয়ালার দেহের পাশে। কিন্তু বাড়ির সদর দরজাটা খোলা নেই, ভিতর থেকে বন্ধ। এ থেকে কি বুঝতে হয়?...কিন্তু আমি কি ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি জানো? এত কাণ্ড করে বারবার পুলিশকে অত সহজে ফাঁকি দিয়ে, অলৌকিক দস্যু কি শেষটা এমন নির্বোধের মতো আমাদের হাতের মুঠোয় এসে পড়বে?

রহস্যময় হাস্য করে জয়ন্ত বললে, এজন্যে আমি একটুও বিস্মিত নই। সুন্দরবাবু, আপনাদের ওই অলৌকিক দস্যুর অবস্থা হয়েছে এখন চালকহীন চলন্ত গাড়ির মতো।

তার মানে?

চালককে আপনারা লক আপে রেখেছেন?

মোহনেন্দুর কথা বলছ?

হ্যাঁ। দেহের চালক হচ্ছে মস্তিষ্ক। অলৌকিক দস্যুর মস্তিষ্ক এখন আপ্পাদের হস্তগত হয়েছে। এখন তাকে বুদ্ধি দেওয়ার কেউ নেই। তাই সে নির্বোধের মতো আচরণ করতে পারে।

তুমি কি বলতে চাও, যত নষ্টের মূল ওই মোহনেই?

নিশ্চয়ই!

তোমার যুক্তি বুঝতে পারলুম না।

এখনই বুঝতে পারবেন। আমরা ঘটনাস্থলে এসে পড়েছি।

সেই দোতলা লালরঙের বাড়ি। সামনে কৌতূহলী জনতা ও দলে দলে পুলিশকারুর হাতে লাঠি, কারুর হাতে বন্দুক।

সদর দরজার সামনে গিয়ে সুন্দরবাবু মাটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। সেখানে রক্তের দাগ।

সুন্দরবাবু সদর দরজার উপরে সজোরে ধাক্কা মারতে মারতে চিৎকার করে বললেন, বাড়ির ভিতরে কে আছ? দরজা খোলো, দরজা খোলো।

সকলে নিশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল, কিন্তু কেউ সাড়াও দিলে না, দরজাও খুললে না।

সুন্দরবাবু বললেন, আচ্ছা, আগে মোহনেন্দুকে এখানে নিয়ে এসো। যদি তার ডাকেও কেউ সাড়া না দেয়, তাহলে দরজাটা ভেঙে ফেলতে বেশিক্ষণ লাগবে না।

কিন্তু এমন সময়ে ঘটল এক বিচিত্র অঘটন। ঝনাৎ করে বাড়ির দরজা খুলে পথের উপরে লাফিয়ে পড়ল প্রকাণ্ড এক শরীরী দুঃস্বপ্ন–দুই চক্ষে তার ধক ধক করে জ্বলে উঠল দু-দুটো সুদীর্ঘ ও উগ্র অগ্নিশিখা–পায়ে পায়ে সে সুন্দরবাবুর দিকে এগুতে এগুতে বললে, ভোঁ-ভোঁ, ভোঁ-ভোঁ, ভোঁ-ভোঁ। অলৌকিক দস্যু!

সুন্দরবাবু পায়ে-পায়ে পিছোতে-পিছোতে বললেন, আবার ভেঁ-ভেঁ? বন্দুক ছোড়, বন্দুক

এমন সময় মোহনেন্দু কোথা থেকে উদভ্রান্তের মতো ছুটে এসে সকাতরে বলে উঠল, বন্দুক ছুড়বেন না বন্দুক ছুড়বেন না–আমি ওকে এখনি নিশ্চল করে দিচ্ছি!

কিন্তু ইতিমধ্যেই গর্জন করে উঠেছে একসঙ্গে অনেকগুলো বন্দুক! সেই বর্মাবৃত, অতিকায়, অবিশ্বাস্য মূর্তিটা তৎক্ষণাৎ ভূতলশায়ী হল ঠিক ছিন্নমূল বৃক্ষের মতোই–সে একটি মাত্র আর্তনাদও করলে না, মাটিতে পড়ে একবারও ছটফট করলে না। এত সহজে যে এত বড় শত্রুনিপাত হবে, এটা কেউ কল্পনাতেও আনতে পারেনি।

মোহনেন্দু অত্যন্ত ভগ্নস্বরে বলে উঠল, করলেন কী? এ আপনারা করলেন কী? আমার কত সাধনার সফল স্বপ্ন একেবারে বিফল করে দিলেন! আমি এক মুহূর্তের মধ্যেই ওকে নিশ্চল করে দিতুম, কিন্তু আপনারা আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করতে পারলেন না?

সুন্দরবাবু বললেন, মোহনেন্দুবাবু, ও আপনার কে?

আমার মানসপুত্র।

জয়ন্ত এগিয়ে এসে বললে, মানসপুত্রকে মনের ভিতরে রাখলেই আপনি বুদ্ধিমানের কাজ করতেন। কিন্তু তাকে একটা কৃত্রিম আর ভীষণ আকার দিয়ে বাইরের পৃথিবীতে পাঠিয়ে এমন উপদ্রব সৃষ্টি করবার অধিকার আপনার নেই।

মোহনেন্দু বললে, সব কথা যদি আপনারা জানতেন।

আমি জানি, এ হচ্ছে যন্ত্রমানব।

সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে বললেন, যন্ত্রমানব?

মানিক সচমকে বললে, যন্ত্রমানব?

জয়ন্ত বললে, হা, ও হচ্ছে যন্ত্রমানব।

মোহনেন্দু বললে, তা হলেও সব কথা জানা হল না!

সুন্দরবাবু বললেন, এখন যা জানা হল না, আদালতেই তা প্রকাশ পাবে।

মোহনেন্দু উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, আদালতে কি প্রকাশ পাবে মহাশয়? অর্থলোভে কে কোথায় রাহাজানি করেছে, কত মানুষকে জখম করেছে, কত বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে-কেমন এইসব তো? ওসব তো অতি সাধারণ ব্যাপার, পৃথিবীর রাম-শ্যাম-যদু-মধুর দলও তো প্রতিদিন যা করছে, ধরা পড়ছে, জেল খাটছে। কিন্তু আদালতে কি প্রকাশ পাবে আমার বিচিত্র পরিকল্পনার পিছনে আছে উচ্চতর, মহত্তর, কোনও উদ্দেশ্য? আদালতে বড়জোর প্রমাণিত হবে যে, পরের সম্পত্তি লুণ্ঠন করবার জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে এই যন্ত্রমানব। কিন্তু সেইটেই যে বড় সত্য নয়, এটা নিজের হাতে লিখে আমি কালকেই আপনাদের জানাব। আজ আর আমাকে কোনও প্রশ্ন করবেন না, রাম শ্যাম-যদু-মধুর মতো ধরা যখন পড়েছি, তখন আমাকে থানায় বা হাজতে বা জেলখানায় যেখানে খুশি টেনে নিয়ে যেতে পারেন।

.

অষ্টম । পরিচ্ছেদ রোবট

জয়ন্ত ঘরে ঢুকে দেখলে, মানিক একমনে খবরের কাগজ পাঠ করছে।

সে শুধোলে, কালকের ব্যাপারটা কাগজে বেরিয়েছে নাকি?

বেরিয়েছে বইকী।

চেয়ারের উপরে বসে পড়ে জয়ন্ত বললে, পড়ো তো শুনি।

মানিক পাঠ করে যা শোনালে, তা আমাদের পূর্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি মাত্র, সুতরাং এখানে উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু বর্ণনার শেষে কাগজের সংবাদদাতা এই মতটুকু প্রকাশ করেছেন।

যন্ত্রমানব। বিলাতি পুঁথিপত্রে যখন চন্দ্রলোকের যাত্রীদের প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করা হয়, তখন তাহা সম্ভবপর বলিয়া বিশ্বাস না করিলেও আমরা সাগ্রহে পাঠ করি। বিলাতি পুঁথিপত্রে যন্ত্রমানবদের লইয়াও বহু আলোচনা হইয়াছে এবং সেসব আলোচনাও আমরা অল্প উপভোগ করি নাই। মাঝে-মাঝে এ-সংবাদও পাঠ করা যায় যে, পাশ্চাত্যদেশের যান্ত্রিকরা সীমাবদ্ধ। শক্তিসম্পন্ন কলের মানুষ নির্মাণ করিয়াছে এবং তাহারাও সাহায্য করিতেছে সত্যকার মানুষদের নানা কার্যে। কিন্তু সে-সব যন্ত্রমানুষ আসলে খেলাঘরের কলে-দম-দেওয়া পুতুলের উন্নততর ও বৃহত্তর সংস্করণ ছাড়া আর কিছুই নহে।

কিন্তু কল্পনার যন্ত্রমানুষকে প্রায় আসল মানুষের সমকক্ষ করিয়া তুলিয়াছিলেন সর্বপ্রথমে চেকোশ্লোভেকিয়ার কারেল ও জোসেফ ক্যাপেক ভ্রাতৃযুগল, প্রায় একত্রিশ বছর আগে। তাঁদের একখানি পৃথিবীবিখ্যাত নাটক, প্রতীচ্যের দেশে দেশে তাহার অভিনয় হয়। ক্যাপেক ভ্রাতৃযুগল তাদের কল্পনায় সৃষ্ট যন্ত্রমানুষের নাম রাখিয়াছিলেন রোবট। ক্রমে ওই রোবট কথাটি এতটা জনপ্রিয় হইয়া উঠে যে, যন্ত্রমানুষ বুঝাইবার জন্য প্রত্যেক ইংরেজি অভিধানেই রোবট শব্দটি স্থান লাভ করিয়াছে।

কিন্তু বাস্তব জগতে এই রকম প্রায় মানুষের সমকক্ষ রোবট প্রস্তুত করিয়া একজন বাঙালি অপরাধী যে এমনভাবে স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করিবে, এটা ছিল আমাদের নিরঙ্কুশ কল্পনারও অতীত! কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, মোহনেন্দু নিজের অপূর্ব প্রতিভাকে সৎপথে চালনা করিয়া দেশের ও দশের কাছে ধন্যবাদভাজন হইতে পারিল না।

জয়ন্ত বললে, রিপোর্টারের একটু ভুল হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশের সবাই জানে, অনেক বিষয়েই প্রায় মানুষের সমকক্ষ–এমনকী কোনও ক্ষেত্রে মানুষেরও চেয়ে কার্যকর–রোবট প্রস্তুত করা অনায়াসেই সম্ভবপর। এই হালেই এ সম্বন্ধে এক-একটি টাটকা খবর পাওয়া গেছে। সেদিন তোমার কাছে আমি কানাডার Defence Research Board-এর চেয়ারম্যান ডক্টর এইচ. এম. সোলান্ডের কথা তুলেছিলুম মনে আছে?

মানিক বললে, আছে।

তিনি কী বলেন শোনো প্রথম মহাযুদ্ধে যেমন অশ্বের স্থান অধিকার করেছিল ট্যাঙ্ক, ভবিষ্যতের যুদ্ধে পদাতিক সৈন্যদের স্থান দখল করবে তেমনই রোবটরাই। তাদের থাকবে কৃত্রিম শ্রবণ, দৃষ্টি, স্পর্শ ও ঘ্রাণের শক্তি ও তারা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারও করতে পারবে। তারা জলে জাহাজ আর শূন্যে বিমান-চালাবে, রিপোর্ট লিখবে ও রেডিয়োর সাহায্যে নির্দেশ গ্রহণ করবে। আমাদের সৈনিকরা শত্রুদের অগ্নিবর্ষণের ফলে অশান্ত বা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে না। তারা হবে ইলেকট্রনিক স্নায়ু আর স্মৃতিশক্তির অধিকারী। এ-ও প্রকাশ পেয়েছে যে, ডক্টর সোল্যান্ড এরকম যন্ত্রমানুষ প্রস্তুত করবার পদ্ধতি জানেন এবং ইঞ্জিনিয়াররা সেই পদ্ধতিতে কাজ করলেই তা সম্ভবপর হবে।

মানিক বললে, আচ্ছা জয়ন্ত, তুমি কি আগেই বুঝতে পেরেছিলে যে ওই ঘটনাগুলো হচ্ছে যন্ত্রমানুষের কীর্তি?

প্রথমে বুঝতে পারিনি, পরে আন্দাজ করতে পেরেছিলুম।

–কেমন করে?

–যা অপ্রাকৃত বা অলৌকিক, তা আমি বিশ্বাস করি না, তার একটা বৈজ্ঞানিক কারণ খুঁজতে চাই। মানুষ বা অন্য কোনও জীব-জন্তুর চোখে মোটরের হেডলাইটের মতো আলো জ্বলতে পারে না। ধরে নিলুম ওটা যান্ত্রিক কৌশল। তারপর একসঙ্গে একই কণ্ঠে, বহু কণ্ঠের ধ্বনি, ওটাও জীবজগতে অসম্ভব। সুতরাং ধরে নিলুম, মূর্তিটার লোহার আবরণের

তলায় আছে ফোনোগ্রাফের মতো কোনও রেকর্ড করবার যন্ত্র–যা একসঙ্গে নানা কণ্ঠ নিঃসৃত শব্দের পুনরাবৃত্তি করতে পারে। তারপর মূর্তিটার আপাদমস্তক লৌহ আচ্ছাদনে ঢাকা শুনেই আমার মনে পড়ে গেল পাশ্চাত্য দেশের রোবটদের কথা। কিন্তু এখনো আমার সব প্রশ্নের উত্তর পাইনি, তাই মোহনেন্দু লিখিত স্বীকারোক্তির জন্যে অপেক্ষা করছি। ওই যে, সিঁড়ির উপরে সুন্দরবাবুর ভারী ভারী পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি, দেখি উনি কি সমাচার বহন করে আনছেন।

সুন্দরবাবুর প্রবেশ...জয়ন্ত শুধোলে, মোহনেন্দু স্বীকারোক্তি লিখে দিয়েছে?

খানকয় কাগজ টেবিলের উপরে ফেলে দিয়ে সুন্দরবাবু বললেন, হ্যাঁ, এই নাও। বাব্বাঃ, কী কাণ্ড!

কাগজগুলো তুলে নিয়ে জয়ন্ত পড়তে বসল।

.

নবম পরিচ্ছেদ। মোহনেন্দুর কথা

আপনারা কেউ ভাববেন আমি চোর, কেউ ভাববেন আমি রাহাজান, কেউ ভাববেন আমি ডাকাত এবং কেউ বা ভাববেন আমি ওদের চেয়ে নিম্নশ্রেণির জীব।

নিজেকে সাধু বলে প্রচার করতে চাই না, তবে আমার উদ্দেশ্য ও আদর্শ নিয়ে বিচার করে দেখলে বুঝতে পারবেন যে, আমি ওদের কারুরই দলের লোক নই।

ক্যাপেকদের R.U.R নাটক পাঠ করে সর্বপ্রথমে এদিকে আমার মন ও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তারপর পাশ্চাত্য দেশের নানা বিশেষজ্ঞের মতামতের সঙ্গে পরিচিত হই। ক্রমে খবর পাই ওদেশে সত্য সত্যই কেউ কেউ যন্ত্রমানুষ তৈরি করেছেন; তারা ক্যাপেকদের কল্পিত রোবটদের মতো অতটা উন্নত না হলেও তাদের কার্যকলাপ দেখে জনসাধারণ বিপুল বিস্ময়ে অভিভূত না হয়ে পারেনি।

কিঞ্চিৎ পৈতৃক সম্পত্তি ছিল। তারই উপরে নির্ভর করে আমেরিকায় গিয়ে হাজির হলুম, কারণ আধুনিক যন্ত্র-যুগে আমেরিকাই সবচেয়ে অগ্রসর দেশ। সেখানে সুদীর্ঘ আট বৎসরকাল থেকে বিভিন্ন যন্ত্রবিদ্যাবিশারদের অধীনে শিক্ষালাভ ও হাতে-নাতে কাজ করে ফিরে আসি আবার বাংলাদেশে। বলে রাখা উচিত, ওই সময়ের মধ্যে আমি বিজ্ঞানের আরও নানা বিভাগে ঘনিষ্ঠ জ্ঞান অর্জন করেছি।

তারপর কত গভীর চিন্তা, কত প্রাণপণ সাধনা, কত দুরূহ পরীক্ষার আর বার বার ব্যর্থতার পর আমার আদর্শানুযায়ী যন্ত্রমানব সৃষ্টি করলুম, এখানে তার দীর্ঘ ইতিহাস দিয়ে আপনাদের মন ভারাক্রান্ত করতে চাই না।

সফল হয়ে বেড়ে উঠল আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা। কথায় আছে, আশাবধিং কো গতঃ- আশার শেষ নেই। আর তাই-ই হল আমার পতনের কারণ। ভাবলুম, সৃষ্টি করব দলে-দলে এমন যন্ত্রমানুষ-যাদের সংখ্যা কেউ গুণে উঠতে পারবে না, যারা সত্যিকার মানুষের চেয়ে হবে ঢের বেশি শ্রমশীল, আজ্ঞাপালক ও কষ্টসহিষ্ণু। সেই সব নকল মানুষের সাহায্যে আমি আসল মানুষের সমাজকে অধিকতর উন্নত ও শ্রীমন্ত করে তুলব।

এই উচ্চাকাঙ্খাই হল আমার কাল। কারণ প্রথম যন্ত্রমানুষ তৈরি করবার জন্যে আমাকে বিবিধ পরীক্ষাকার্যে নিযুক্ত হতে হয়েছিল এবং তাইতেই নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল আমার পৈতৃক সম্পত্তির অধিকাংশই। দলে দলে নতুন যন্ত্রমানুষ প্রস্তুত করতে গেলে দরকার হবে প্রচুর টাকা। সে টাকা পাব কোথায়?

সেই সময়েই আমার মাথায় আসে যন্ত্রমানুষের সাহায্যে রাহাজানি করবার দুবুদ্ধি। স্থির করলুম যে সব অবাঙালি বাংলার রক্তশোষণ করতে আসে, তাদের পিছনে যন্ত্রমানুষকে লেলিয়ে দিয়ে জোগাড় করব আমার মূলধন। তারপর সেই টাকায় নতুন নতুন যন্ত্রমানুষ তৈরি করে তাদের নিযুক্ত করব বাংলাদেশের গঠনমূলক কার্যে। রাহাজানির জন্যে যে পাপ হবে, সে পাপ ক্ষালন করব স্বদেশের মঙ্গলসাধন করে, এই ছিল আমার যুক্তি।

হয়তো এই যুক্তি ভুল। সাফল্যর গর্বে আগে তা বুঝিনি, এখন বুঝতে পারছি। সমাজবিরোধী কার্যের দ্বারা সমাজের মঙ্গলসাধন হয় না।

এখন আমার সৃষ্ট যন্ত্রমানুষের কয়েকটি বিশেষত্বের কথা সংক্ষেপে বলব।

এর শরীরের অধিকাংশই ইস্পাত দিয়ে তৈরি। এর পায়ের তলায় আছে রোলার- সমতল মেঝের উপর দিয়ে বেগে ছুটবার জন্যে। এ চিন্তা করতে পারে। এর মধ্যে খানিকটা ব্রেন টিস্যু রাখবার ব্যবস্থা করেছি-তবে মানুষের মতো এর মাথার ভিতরে তা থাকে না, থাকে তামার আধারে বুকের ভিতরে। এর স্মৃতিশক্তি আছে।

এর দুই চক্ষুর জায়গায় যে দুটো অগ্নিশিখা আছে, সে দুটো সত্য-সত্যই কেবল হেডলাইটের কাজ করে-ওর আসল চোখগুলো আছে পূর্বকথিত ওই তামার মস্তিষ্ক-বাক্সের মধ্যে এবং সংখ্যায় তারা দশটি। ওই তামার আধার বা বাক্সটিই হচ্ছে প্রায় এর সর্বস্ব, কারণ ওইখানেই মস্তিষ্ক ও চোখের সঙ্গে আছে ওর শ্রবণযন্ত্র ও ঘ্রাণযন্ত্রও! আপনাদের অজ্ঞ সেপাইরা যন্ত্রমানুষের প্রাণপদার্থের মতো ওই তামার বাক্সটিই গুলি ছুঁড়ে নষ্ট করে দিয়েছে। ধাতু দিয়ে একটা ছোট বা বড় পুতুল গড়া কিছুমাত্র কঠিন নয়, কিন্তু প্রাণপদার্থ নষ্ট হলে নষ্ট হয় তার সর্বস্বই।

যন্ত্রমানুষ একটা অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ করতে পারে বটে, কিন্তু কথা কইতে পারে না। তবে সে কানে যা শোনে রেকর্ড করতে পারে এবং সেইজন্যই তার মধ্যে ম্যাগনেশিয়াম তার জড়ানো একটি কাঠিম আছে। সে আঁক কষতে পারে, হিসাব রাখতে পারে, ফোনে ডাক এলে রিসিভার ধরতে পারে। সে করতে পারে আরও অনেক কিছুই।

আমার হুকুম দেবতার হুকুম বলে মানতে বাধ্য। কিন্তু কলকবজার কথা জোর করে কিছুই বলা যায় না। যাতে হঠাৎ অবাধ্য হয়ে সে কোনও অকার্য-কুকার্য করতে না পারে, সেইজন্যে তারও উপায় রেখেছি আমার নিজের হাতেই। পকেট-ক্যামেরার মতো ছোট্ট একটি জিনিস সর্বদাই আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। যন্ত্রমানুষ যত দূরেই যাক না কেন, সে আমার মতবিরুদ্ধ কোনও কাজ করলেই আমি ওই যন্ত্রের সাহায্যে তৎক্ষণাৎ জানতে

পারব এবং বহুদূর থেকেই সঙ্গে সঙ্গে কল টিপে হরণ করব তার সকল শক্তিই। আরও অনেক কথাই বলতে পারতুম, কিন্তু বললুম না এইজন্যে যে, বিশেষজ্ঞ ছাড়া সেসব অন্য কেউ বুঝতে পারবেন না। আর বলেই বা কি হবে? আমার আশার স্বপ্ন তো ভেঙে গিয়েছে, এখন দিন-রাত কেবল চোখের সামনে দেখছি, খোলা রয়েছে কারাগারের দ্বার।